আনন্দলোকে হুমায়ূন আহমেদ

শাহ আলম সাজু

কিংবদন্তী কথাশিল্পী, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার পাক্ষিক আনন্দধারার জন্য বিভিন্ন সময়ে নেয়া হয়েছে। তাঁর জন্মদিনের রিপোর্টও করা হয়েছে। একইভাবে হুমায়ূন আহমেদ-এর নাটক ও সিনেমার বহু রিপোর্ট ছাপা হয়েছে আনন্দধারায়। খ্যাতিমান এই লেখক বিভিন্ন সময়ে তাঁর একান্ত কিছু অনুভূতিও প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে শুটিংয়ের সময় জমজমাট আড্ডা দিতেন প্রায় নিয়মিতভাবে। সেসব কথা পত্রিকায় তুলে ধরেছেন সাংবাদিক শাহ আলম সাজু। তাঁর বলা কথা নিয়েই 'আনন্দলোকে হুমায়ূন আহমেদ'। বইটি পড়লে জানা যাবে অন্য এক হুমায়ূন আহমেদকে।

প্রচ্ছদ ▪ হাবিবুর রহমান

আনন্দলোকে হুমায়ূন আহমেদ

শাহ আলম সাজু

শব্দশিল্প

আনন্দলোকে হুমায়ূন আহমেদ
শাহ আলম সাজু
স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১২
প্রকাশক
মোঃ শরিফুর রহমান
শব্দশিল্প
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
হাবিবুর রহমান

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৫০.০০

Annondo Loka Humayun Ahmed By Shah Alam Shazu *Published by Md. Sharifur Rahman of Shabdoshilpo, 38, Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100. frist Edition : December 2012, Two Thousand Twelve. Price : 150.00 Only.*

ISBN : 984-70323-0183-2

উৎসর্গ

হুমায়ূন আহমেদ
হুমায়ূন ফরীদি
রেজাউর রহমান রিপন
তিন জন প্রিয় মানুষ।
তিন জনই এখন না ফেরার দেশে।
পরম করুণাময় তাদের আত্মাকে শান্তিতে রাখুক।

আমার ঘেটুপুত্র কমলা

হুমায়ূন আহমেদ

ছবির বিশেষত্বের ব্যাপারে যদি ফিল্মের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে ৫০টি বিশেষত্ব বলে দিতে পারবে। বিপ্লবী কাহিনী, অমুক কাহিনী ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তো এগুলো বলব না। কাজেই আমার কাছে ঘেঁটুপুত্র কমলার বিশেষত্ব জানতে চাওয়া অর্থহীন। কোনো বিশেষত্ব নেই। আগে যেমন ছবি বানিয়েছি, ঘেঁটুপুত্র কমলাও সেভাবেই বানাব। ভালো হলে হবে, না হলে হবে না। অন্য ছবি বানাতে গিয়ে যে সব ভুল করেছি ঘেঁটুপুত্র কমলা বানাতে গিয়ে সেসব ভুল আবারও করব কিংবা হয়তো বা ভুল শোধরাব। জানি না কী করব।

ঘেঁটুপুত্র কমলা ছবিটি বানাতে একটু দেরি হয়ে গেছে। আমরা সব প্রপস সময়মতো জোগাড় করতে পারিনি। কিছু কিছু নিজেদের জোগাড় করতে হয়েছে। আমরা নিজেরা একটি সিন্দুক বানিয়েছি। প্রচুর জিনিসপত্র দিনের পর দিন ধরে কেনা হয়েছে। আমি চেয়েছি ঘেঁটুপুত্র কমলাতে বাংলাদেশের একটা ট্রেন্ড ধরে রাখতে। বাংলাদেশের একটা জায়গা ধরতে। জায়গাটা হচ্ছে হাওর এলাকা। হাওর এলাকা বর্ষাকালে সম্পূর্ণ পানিতে ডুবে থাকে। যেদিকে তাকাব ধু ধু পানি। আর কিছু নেই। এবং সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে। একই জায়গা আবার শীতের সময় শুকনো, খটখটে হয়ে যায়। এই ছবিটি যদি বিদেশিরা দেখে, ওরা অবাক হয়ে ভাববে–এটা বাংলাদেশ! এ রকম পানি থাকে একটা সময়ে। এটাই আবার শুকনো হয়ে যায়? এটা করার জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট নিয়ে নিয়ে শট নিতে হবে। লেন্স ব্যবহার করে, একই রেফারেন্সে শুকনার শটটা নিতে হবে।

ছবি নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি চলছে। নুহাশপল্লীতে সেট তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু সময় পরিবর্তন করতে হচ্ছে। ঘেঁটুপুত্র কমলার জন্য শুরুতে যে মিউজিক ডিরেক্টর নিয়েছিলাম, কিছুদিন পর আমার মনে হলো তিনি মিউজিকের ব্যাপারটা ঠিকভাবে ধরতে পারছেন না। এ কারণে মিউজিক ডিরেক্টর বদল করেছি।

শুরুতে যে ক্যামেরাম্যান নিয়েছিলাম, একটা পর্যায়ে আমার মনে হলো তার সঙ্গে সেরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার হবে না। তাকে বদল করলাম। এ রকম অদল-বদলের ভেতর দিয়ে গিয়ে গিয়ে এক সময় ছবিটি শুরু করব। শেষও হবে। এভাবে আমার ছবিটি বানাতে দেরি হয়ে গেছে।

সব ছবির শুটিংয়ের সময় স্ত্রী শাওন আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে, উপস্থিত থাকে। কমফোর্ট দেয়। প্রচণ্ড পরিশ্রমের সময় এক কাপ চা নিয়ে আসাও তো বিশাল একটা কমফোর্ট। রাত্রিবেলা কাজটি ভালো হয়েছে এ নিয়ে গল্প করাও কমফোর্ট। সে এ মুহূর্তে আমাকে সময়টা দিতে পারছে না। কারণ সে একটা বেবি কেরি করছে। এখন তার আমাকে সময় দেওয়া সম্ভব নয়। এটাও ছবির শুটিং পেছানোর একটা কারণ। ঘেঁটুপুত্র কমলার যিনি প্রধান আর্টিস্ট তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারত– এই আশঙ্কাটাও ছবি পেছানোর পেছনে কাজ করছে।

চেয়েছিলাম নিজের পয়সায় ছবিটা বানাতে। পয়সা খরচ করে ফেলেছি। এখন বাইরের প্রযোজক খুঁজতে হচ্ছে সেটাও তো একটা সমস্যা। আমাদের দেশে ছবি বানানোর অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থলগ্নি। কারিগরি দিক থেকে আমরা যে খুব পেছনে তা তো নয়। বাইরের দেশ যে ক্যামেরা ব্যবহার করে, আমরাও সেই একই ক্যামেরা ব্যবহার করি। আমাদের এখানে সিনেমার মুদ্রণ-পরিস্ফুটনের অবস্থা খারাপ। আমরা ছবিগুলো বাইরে প্রিন্ট করাই। বাইরের দেশ যে লেন্স ব্যবহার করে আমরাও একই লেন্স ব্যবহার করি। বাইরের দেশে যে পরিমাণ অর্থ তারা ব্যয় করে সে পরিমাণ অর্থ তো আমরা ব্যয় করতে পারি না। আমাদের বাজারও ছোট। সব মিলিয়ে আমরা এই অবস্থায় আছি।

ঘেঁটুপুত্র কমলার ইনডোরের শুটিং হবে নুহাশপল্লীতে। আউটডোরের শুটিং হবে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায়।

স্ক্রিপ্টের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন তারিক আনাম খান। নুহাশপল্লীতে একটি সেট তৈরি করা হয়েছে বেশ সময় নিয়ে। এর পুরো ডিজাইন আমার করা। ওই সময়ের এলাকার প্রভাবশালীর বাড়ি যেমন ছিল, তেমনভাবেই বাড়িটি বানানোর চেষ্টা করেছি।

ঘেঁটু গানের একটা পটভূমি আছে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে জলসুখা বলে একটা গ্রাম আছে সেখানে ঘেঁটু গানের জন্ম। এটা সুনামগঞ্জের গ্রাম। তারা করত কী– ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে গানটা করত। ছেলের লম্বা চুল থাকত। সম্পূর্ণ মেয়ের সাজ যাকে বলে। গানের কথাগুলো ততোধিক শালীন না হলেও সুরটা ছিল সব সময় ক্ল্যাসিক। যেহেতু একটা মেয়েকে ছেলে সাজাচ্ছে সেহেতু এর মধ্যে কিছুটা কদাচার ঢুকে পড়ে। বিত্তবানরা এসব ছেলেদের কামনা করতে চেষ্টা করে, রাখতে চেষ্টা করে শারীরিক প্রয়োজনে। সেটা সে সময় সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিল। ফলে এ কদাচার আমাদের সমাজে ঢুকে গিয়েছিল। তিন মাস পানিবন্দি থাকত লোকজন। যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা ঘেঁটু ছেলে নিয়ে আসত।

দুর্ভাগ্যক্রমে এখন ঘেঁটু গান নেই। এতে একটাই ক্ষতি হয়েছে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারার সংগীত নষ্ট হয়ে গেছে। ভালো যেটা হয়েছে সমাজ থেকে একটা কদাচার দূর হয়েছে। এই হলো ঘেঁটু গানের মূল ইতিহাস। দেড়শ বছর

আগের কথা। দেড়শ বছর আগে সিলেটের সুনামগঞ্জের জলসুখা গ্রামে প্রথম ঘেঁটু গান শুরু হয়। প্রথম শুরু হয় বৈষ্ণব আখড়ায়।

পাদটীকা : কথাশিল্পী-চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ সেদিন ছিলেন প্রচ-ব্যস্ত। নুহাশপল্লীতে তিনি শুটিং করছিলেন ঈদের একটি নাটকের। সেই ব্যস্ততার ফাঁকে আনন্দধারার জন্য তিনি কথা বলেছেন আমার সঙ্গে।

আমার শেষ ছবি

–হুমায়ূন আহমেদ

সাধারণত বেশি মানুষ থাকলে কথা বলতে পারি না। অল্প মানুষের মধ্যে থাকলে প্রচুর কথা বলি। এটা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ফল। প্রতি ক্লাসে আমার ছাত্র থাকত ৩০ থেকে ৩৫ জন। এদের সঙ্গে কথা বলতাম। এখন যারা এখানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, তারা কেউই আমার ছাত্র না। এখানে আছে চ্যানেল আই প্রধান ফরিদুর রেজা সাগর। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু দিনের। তার মা একজন লেখিকা। আমি একজন লেখক। সেই সূত্রেও আমাদের পরিচয় গভীর। ফরিদুর রেজা সাগরের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি– এ ছবির জন্য যে পরিমাণ বাজেট তারা দিয়েছে, ওই বাজেটের টাকা ছবি শুরু করার আগেই শেষ করে ফেলেছি। ভবিষ্যতে কী হবে, তা আমি জানি না।

ছবির বিষয়ে বলি। ছবির নাম 'ঘেটুপুত্র কমলা'। অনেক আগে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম। একটি ঘেঁটু ছেলেকে নিয়ে। তখন থেকেই সম্ভবত ঘেঁটুপুত্র কমলাকে নিয়ে ছবি বানানোর গল্প মাথার মধ্যে ঘুরছে। ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। ঘেঁটু ছেলে পাওয়া ছিল কঠিন। জটিল ব্যাপার। একটি সিনেমার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করাও হচ্ছে আরেক জটিল ব্যাপার। লোকেশন ছিল তার চেয়েও বেশি জটিল ব্যাপার। আমি লোকেশন চেয়েছি হাওর। বিদেশিরা যখন ছবিটি দেখবে, তখন অবাক হয়ে দেখবে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রের মতো পানিতে ঢাকা। আবার এক সময় সেটা খটখটে শুকনো। সেই অঞ্চলে আমি কোথায় পাব? দেখে সবাই চমকাবে। অন্যরকম ব্যাপার। হাওর অঞ্চল ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে সুনামগঞ্জের জলসুখা গ্রামে বৈষ্ণব আখড়ায় ঘেঁটু গান শুরু হয়। ওটা দেড়শ বছর আগের কথা। সেখানে একটি ছেলেকে তারা মেয়ে সাজাতো এবং নাচ-গান করাতো। কারণ বিত্তশালীরা স্ত্রীর মতো কামনা করত ঘেঁটু পুত্রদের। তাদের স্ত্রীরা সতীন ভাবত ঘেঁটু পুত্রকে।

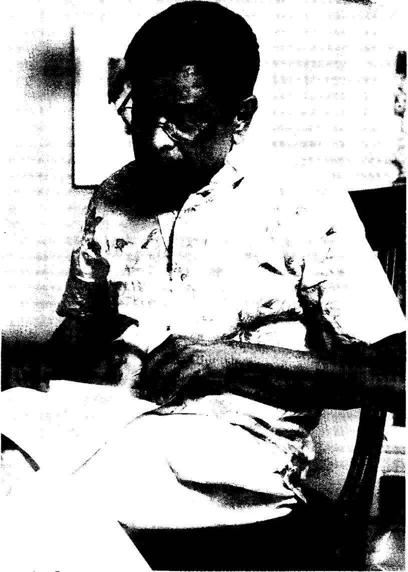

ঘটনাটি শুধু বাংলাদেশে ঘটতো তা নয়, কলকাতার বাবুদের সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানেও বাবুরা সন্ধ্যাবেলায় ঘেঁটু পুত্রকে নিয়ে বসে যেতেন।

সৌভাগ্যের বিষয় ঘেঁটু গান ছিল আমাদের সংগীতের খুবই বিশুদ্ধ একটি গান। সেটি ক্রমশ হারিয়ে গেছে। আমি সেই সময়টাকে ধরার চেষ্টা করছি। সময়টাকে ধরা খুব কঠিন ব্যাপার। তবুও ধরার চেষ্টা করছি। সেই সময়

একটু ঘেঁটু ছেলের যে দুঃখ, যে বেদনা, যে অর্ন্তযন্ত্রণা, তা ধরার চেষ্টা করছি। কতটুকু পারছি আমি জানি না।

যখন ছবি বানাই, ছবি বানানোর পর পর বলি যে ভুলগুলো আমার ছবিতে করেছি তা আর করব না। তারপরও প্রত্যেকবার একই ভুল করি। এবার আমার সঙ্গে এক ঝাঁক তরুণ ছেলেপেলে রয়েছে। যারা এসব ব্যাপারে অনেক স্ট্রং। কেউ ইংল্যান্ড থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। কেউ সুইডেন থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। তাদের দায়িত্ব হলো আমি যদি ভুল করি, সেগুলো ধরিয়ে দেওয়া।

ছবির শুটিং করছি নুহাপল্লীতে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এই দুই জায়গাতেই শুটিং হচ্ছে। সবার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এটাই হবে আমার শেষ ছবি। কারণ ছবি বানানো জন্য যে ধৈর্য তা আমার নেই। প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। আমি লেখক মানুষ। লেখালেখি করেই আনন্দ পাই।

লোকেশন খোঁজাখুঁজিটা চলছিল বছরখানেক ধরে। পছন্দ হচ্ছিল না নানা কারণে। শুটিংয়ের কিছুদিন আগে পরিচালক শাকুর মজিদ এবং অভিনেতা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় খোঁজ দিল একটি বাড়ির। সেখানকার ছবি তুলে আনা হলো।

কিন্তু পছন্দ হলেই তো হবে না, অত পুরনো বাড়ি ব্যবহার উপযোগী করাও অনেক সময়ের ব্যাপার। শ্রমসাধ্য। যারা বাড়িটিতে থাকতেন তাদের অন্যত্র সরিয়ে থাকা-খাওয়া নিশ্চিত করা হলো। শুরু হলো ভবন সংস্কার।

ভাড়া করা নৌকা এনে ঘাটে বাঁধা হলো। আনা হলো সুদৃশ্য ঘোড়া। ঘষামাজা হলো চারপাশ। নানা আয়োজনে পুরনো জৌলুস ফিরিয়ে আনা হলো।

২৫ থেকে ৩১ নভেম্বর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হলো সেখানে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ নভেম্বর থেকে নুহাশপল্লীতে। তারপর ইউনিট আবার হরিপুর গ্রামে। দুই মৌসুমের শুটিং। বর্ষা আর শীত।

বছর দুয়েক ঘুরে ঘুরে এ ছবির প্রপস সংগ্রহ করেছি। ছবিটি বানাতে একজন দেরি হয়ে গেছে। সময়মতো সব প্রপস জোগাড় করা কঠিন কাজ।

কিছু কিছু নিজেদের জোগাড় করতে হয়েছে। নিজেরা একটি সিন্দুক বানিয়েছি। আমি চেয়েছি এ ছবিতে বাংলাদেশের ট্র্যাডিশন ধরে রাখতে।

ঘেঁটু গানের পটভূমির কথা আগেও বলেছি। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে জলসুখা গ্রামে এ গানের জন্ম। জলসুখা হচ্ছে সুনামগঞ্জের এক গ্রাম। এ গান শুরু হয় বৈষ্ণব আখড়ায়।

পাদটীকা : চ্যানেল আইতে ঘেঁটুপুত্র কমলা সিনেমার মহরত অনুষ্ঠানে নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ কথাগুলো বলেন আনন্দধারার প্রতিনিধি শাহ আলম সাজুর সাথে।

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ৭ ঘণ্টা

ভালো লাগাটা অনেকখানি বেশিই কাজ করেছিল মনে মনে। ভালো লাগার অন্যতম প্রধান কারণ হুমায়ূন আহমেদের শুটিং স্পটে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। হুমায়ূন আহমেদের প্রধান সহকারী পরিচালক জুয়েল রানার সঙ্গে কথা হয় আমাদের। পরের দিন সকাল বেলা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বৃষ্টি। আর বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়ি নুহাশপল্লীতে যাওয়ার জন্য। উত্তরা থেকে প্রভাতী বনশ্রী পরিবহন হয় আমাদের প্রথম বাহন। অবশ্য নুহাশপল্লীতে যাওয়ার জন্য সিটিং সার্ভিস বাস গাড়িও তেমন নেই। হাতের পাঁচ হিসাবে প্রভাতী বনশ্রীকেই বেছে নিতে হয়। নামে সিটিং থাকলেও টিকেট কেটে বসার সিটি না পেয়ে রাজ্যের বিরক্তি ভর করে আমার ও ফটোগ্রাফারের।

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ-এর সঙ্গে সাংবাদিক শাহ আলম সাজু

কী আর করা। দাঁড়িয়েই ছুটে চলা। বৃষ্টি তখনও কমেনি। বৃষ্টির কারণে যানজট। এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায় গাজীপুর পর্যন্ত পৌঁছাতে। ভাগ্যিস

গাজীপুর গিয়ে বসার সিট পাওয়া গেল। যেন বড় কিছু পেলাম। আমার ফটোগ্রাফারের মুখে সামান্য হাসি ফিরে এলো।

গাজীপুরে পৌঁছে জুয়েল রানাকে আবার ফোন দিলাম। উদ্দেশ্য নুহাশপল্লীতে কীভাবে যাব সেটা জানার জন্য। জুয়েল রানা জানালেন হোতাপাড়ায় নেমে যেতে হবে আমাদের। একটা সময় হোতাপাড়া নেমে যাই আমরা। এবার বৃষ্টি নামে জোরোশোরে। দৌড়ে একটি সেলুন প্রবেশ করি। মনে মনে বৃষ্টিকে বকাঝকাও করি।

ফটোগ্রাফার আকাশ বলল, নুহাশপল্লীতে যাবার পর বৃষ্টিটা শুরু হলে ভালো হতো।

আমি বললাম, বৃষ্টি যদি মানুষের কথা শুনতো তাহলে তো ভালোই ছিল।

হোতাপাড়ায় ত্রিশ মিনিটের মতো অলস সময় পার করলাম। বৃষ্টি বিদায় নিল।

তড়িঘড়ি করে নুহাশপল্লীতে যাওয়ার জন্য বাহন খুঁজতে লাগলাম। রিকশা, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি সবার সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত বেবিট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিলাম।

গহীন শাল-গজারির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। পথ যেন ফুরায় না।

মীর সাব্বিরের ফোন এলো, তোমরা কই?

জানালাম জঙ্গলের সঙ্গে মিতালী করতে করতে আসছি।

বেবিট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, চিন্তা কইরেন না, নুহাশপল্লী বনের পক্ষীও চেনে। ঠিক ঠিক আপনাগো লাইয়া যামু। বেবিট্যাক্সির যাত্রা শেষ। কিছু কাদাপানির রাস্তা হেঁটে নুহাশপল্লীর গেটে প্রবেশ করলাম এবং যথারীতি গেটের দারোয়ান ভেতর থেকে অনুমতি নিয়ে আসার পর ভেতরে প্রবেশ করলাম।

নুহাশপল্লীর ভেতরে প্রবেশ করে যে কেউ প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমরাও মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

যথারীতি শুটিং হচ্ছিল সকাল থেকে। আমরা শুটিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। এই রোদ এবং এই বৃষ্টি। এমনি পরিবেশে শুটিং হচ্ছে হুমায়ূন আহমদ বললেন, চলো একবার রিহার্সেল করে নেওয়া যাক। শুরু হলো রিহার্সেল। মেহের আফরোজ শাওন, মীর সাব্বির ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় রিহার্সেল করলেন। রিহার্সেল শেষ করে ক্যামেরার সামনে গিয়ে আরেকবার রিহার্সেল করলেন। এই রোদ এই বৃষ্টির খেলা তখনও চলছেই। প্রডাকশনের লোকজন ছাতা মেলে ধরলেন। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এবার শট দাও।

ছাতা নিয়ে সরে এলো সবাই। চেয়ারে বসে মনিটরে চোখ রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। যে দৃশ্যটি ধারণ করা হলো তা এ রকম শাওন ও মীর সাব্বির কথা বলবেন, ওই সময় একটি দৈত্য এসে উপস্থিত হবে সেখানে। খুব সুন্দরভাবে দৃশ্যটির কাজ চূড়ান্ত হয়। এবার লাঞ্চ বিরতির পালা।

জুয়েল রানা বলেন, একটু পর লাঞ্চ বিরতি দিলে ভালো হয়। তাহলে নাগরদোলার দৃশ্যটি ধারণ করা যাবে।

মেহের আফরোজ শাওন বলেন, লাঞ্চ বিরতি দিতেই হবে পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও।

অতঃপর লাঞ্চ বিরতি পর্ব চলে এলো।

লাঞ্চ সারতে সারতেই জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মীর সাব্বির গল্প জুড়ে দিলেন।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদ, নিষাদ ও সাজু

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন, নাটক করা অনেক কষ্ট। নাটক আর ভালো লাগে না। এখন থেকে টক শো করব। সকালবেলা বেরিয়ে যাব আর টক শো শেষ করে ফিরে আসব সন্ধ্যায়।

মীর সাব্বির বললেন, দাদা, দুটি জামা কিন্তু সঙ্গে নেবেন। এক শার্ট দিয়ে দুটি টকশো করা যাবে না।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় মজা করে বললেন, তুই ভাবিস না সাব্বির, কয়েকটি চ্যানেলে পোশাক রেখেই আসব।

লাঞ্চ বিরতি শেষ।

নাগরদোলায় উঠতে হবে মীর সাব্বির, শাওন এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। সেভাবেই প্রস্তুতি চলল।

এবার আর বৃষ্টি ঝামেলা পাকালো না। ক্যামেলা, লাইট, মনিটর, বুম সব রেডি করা হলো।

ঝামেলা তৈরি হলো নাগরদোলায় শুটিং করা নিয়ে। কেননা নাগরদোলায় বসে শট নিতে হবে। ক্যামেরাম্যান উঠে গেলেন নাগরদোলায়া শাওন, মীর সাব্বির ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বসলেন নাগরদোলায় কিন্তু নাগরদোলায় বসে শট নিতে হবে এ জন্য বেশ সময় লাগল। এদিকে মনিটরে বসে চোখ রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ।

প্রায় ঘণ্টাখানিক লেগে গেল নাগরদোলার দৃশ্যটি শেষ করতে।

দৃশ্যটি শেষ করে হাসতে হাসতে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, শুটিং করা মেলা কষ্ট। আর শুটিং করব না। টক শো করব।

শুটিং এগিয়ে চলল।

পরের দৃশ্যের সেট ফালানোর নির্দেশ দেয়া হলো এবং সেই অনুযায়ী লীলাবতী দিঘির দিকে ছুটলেন সবাই।

নুহাশপল্লীতে কিংবদন্তী কথাশিল্পীর সান্নিধ্যে সাজু

এই ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদের পুত্র নিষাদ যোগ দিল শুটিংয়ে। হুমায়ূন আহমেদ নিষাদকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন এবং আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য ইশারা করলেন। নুহাশ পল্লীতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাখি, রাজহাঁস, মুরগি। একটি বিদেশি মুরগি দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এটার নাম টার্কি। আমেরিকান সোলজাররা এটি খায়।

আমাকে উদ্দেশ্য করে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, আগে কখনও এসেছ নুহাশ পল্লীতে?

আমি বললাম, না, স্যার, আসিনি।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, তাহলে চলো এবার গাছের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। জানো তো, এখানে অনেক প্রজাতির ঔষধি গাছ আছে। আমি বললাম, নুহাশ পল্লীর গাছ সম্পর্কে আপার লেখায় পড়েছি।

একটি গাছ দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এই গাছটির নাম রসুন্দি। গাছের পাতার গন্ধ আর রসুনের গন্ধ একই।

মুগ্ধতার সঙ্গে কথা শুনলাম।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, একটা পাতা ছিঁড়ে হাতের তালুতে ঘষে দেখ তো?

তাই করলাম।

দেখি সত্যি সত্যি রসুনের গন্ধ।

আরেকটি গাছের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, এই গাছের পাতায় সব মসলার স্বাদ পাবে। একদিন মুরগির মাংসের সঙ্গে মসলা হিসাবে রান্না করেছিলাম। ভারী টেস্ট।

গাছের পাতাটি হাতের তালুতে নিয়ে রসুন্দি গাছের পাতার মতো করে ঘষলাম এবং সত্যি সত্যি সব মসলা একত্রে করলে যে গন্ধ হয় তাই টের পেলাম।

এক এক করে হুমায়ূন আহমেদ অনেক গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

একটি গাছের কাছে গিয়ে বললেন, একটি পাতা মুখে নিয়ে চিবোতে থাক, চিনির মতো স্বাদ পাবে। সত্যি সত্যি তাই পেলাম।

লজ্জাবতী গাছ দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এমন লজ্জাবতী গাছ দেখেছ কখনও?

আমি বললাম, স্যার গ্রামে প্রচুর ছোট ছোট লজ্জাবতী গাছ দেখেছি কিন্তু এ রকম দেখিনি।

কমলাগাছ দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ওই যে দেখ কমলা ধরে আছে। আবার ছোট্ট জাম্বুরা গাছ দেখিয়ে বললেন, দেখ কত্তো ছোট্ট জাম্বুরা গাছে জাম্বুরা ধরেছে। একটি জাম্বুরা ছিঁড়ে পুত্র নিষাদকেও দিলেন।

একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, এটি ডায়াবেটিস রোগীদের খুব কাজে দেয়।

আরেকটি গাছ দেখিয়ে বললেন, এটি মাদ্রাজ থেকে আনা। মাদ্রাজিরা তরকারি রান্না করার সময় মসলা হিসাবে ব্যবহার করে।

অনেক সময় নিয়ে তিনি গাছের সঙ্গে পরিচয় করালেন। হঠাৎ একটি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, বল তো কে আবিষ্কার করেছিলেন গাছের প্রাণ আছে?

আমি বললাম, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, গাছের প্রাণ আছে এটা বহু বছর আগেই আবিস্কৃত হয়ছে। গাছের আবেগ অনুভূতি আছে এটা তিনিই আবিষ্কার করেছেন।

আমি বললাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

হেসে বললেন, করো।

স্যার, এই নির্জন জায়গাটি কেন পছন্দ হলো আপনার?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, একটিই কারণ তা হলো একসঙ্গে এত জমি পেয়েছি। আর কোনও কারণ নেই।

গাছ দেখার পর্ব শেষ।

একজন এসে বলে গেল সেট রেডি।

শুটিং করার জন্য লীলাবতী দীঘির পারে গেলেন। এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ূন আহমেদ জানালেন, ঈদের পাঁচ নাটকের শুটিং একসঙ্গে হচ্ছে। সব তার রচনা ও পরিচালনা।

এবার দীঘির ওপর নির্মিত কাঠের ব্রিজে এ দৃশ্য ধারণ করা হবে।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, পেছনের তাবুটি ভালো লাগছে না, খুলে ফেল।

তাবু খোলার জন্য দৌড় ঝাঁপ শুরু হলো।

কোনও একজনকে ছবি তোলার ক্যামেরা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন হুমায়ূন আহমেদ।

খুব দ্রুত ছবি তোলার ক্যামেরা চলে এলো। পুত্র নিষাদকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকশ গজ দূরে গেলেন এবং ঘাসের ওপর বসে পড়লেন। নিষাদকে বললেন, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসো?

নিষাদ ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে হাসল। অনেক ছবি তুললেন তিনি।

এদিকে তাঁবু তুলে ফেলার কাজ শেষ। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন শাওন ও মীর সাব্বির। তারা দাঁড়ালেন কাঠের ব্রিজের ওপর। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় দাঁড়ালেন তাঁবু ছিল সেখানে।

মনিটরের চোখ রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। ভালো করে দেখলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, শুটিং কেমন লাগছে?

বললাম, ভালো লাগছে।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, সংলাপ দাও?

শুরু হলো দৃশ্য ধারণের কাজ। দৃশটি এ রকম।

নিতু : আমার কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ছে। ঘোরের মধ্যে আছি।

জয়ন্ত : অ্যাকরা ম্যাকরা ছ্যাং?

সাব্বির : এর অর্থ কী?

জয়ন্ত : অর্থ হচ্ছে গান ছাড়ব?

শাওন : এই গান না– মাঝে মঝে তব দেখা পাই, ওই গানটি ছাড়ুন।

মীর সাব্বির বললেন, স্যার হয়নি, আবার সংলাপ দিই।

হুমায়ূন আহমেদ মনিটরে চোখ রেখে বললেন, ভালো করে কর।

যত্ন সহকারে দৃশ্যটির কাজ হলো।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ও কে ডান।

মীর সাব্বির বললেন, স্যার আপনার সঙ্গে একটি ছবি তুলব। এই আকাশ ভাই, স্যারের সঙ্গে সুন্দর করে ছবি তুলে দেন।

ছবি তোলা হলো।

সহকারী পরিচালক জুয়েল রানা বললেন, ঘাটের ওখানে শুটিং হবে। বৃষ্টি পড়ার দৃশ্য।

তাঁবু দিয়ে তৈরি ঘরের দিকে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ। পুত্র নিষাদকে সঙ্গে নিলেন। আমাদেরও যেতে বললেন। ঘরের ভেতর গিয়ে তিনি বললেন, কেমন লাগছে?

বললাম, ভালো লাগছে?

নিষাদকে বললেন, ঘর কেমন লাগছে বাবা?

নিষাদ বলল, ভালো।

সেট রেডি না হওয়া পর্যন্ত গল্প চলল। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, মীর সাব্বির, শাওন ও অন্যরা। এরই মধ্যে নুহাশ পল্লীতে এসে পৌঁছালেন নির্মাতা অনিমেষ আইচ ও অভিনেতা স্বাধীন খসরু। তারাও গল্পে যোগ দিলেন।

এ পর্যায়ে হুমায়ূন আহমেদের কাছে জানতে চাই কী কী নাটকের শুটিং হচ্ছে?

তিনি বললেন, সব জুয়েলের কাছ থেকে শুনে নিও। জুয়েল রানা বললেন, এক সঙ্গে পাঁচটি নাটকের শুটিং চলছে। সব নাটক স্যারের পরিচালনা এবং লেখা। একটি নাটকের নাম 'হামিদ মিঞার ইজ্জত'। এই নাটকটি একজন ফকিরকে ঘিরে এগিয়ে যাবে। ফকিরের তিন মেয়ে। সে পাইপের ভেতরে থাকে। বস্তি এলাকার মতো একটি এলাকায় বড় পাইপে থাকে দিনরাত। আবার ছোট দুটি মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করার সময় সাধু ভাষায় কথা বলে। ভিক্ষা করে সন্ধ্যাবেলায় নীড়ে ফিরে পত্রিকা পড়ে। সব সময় সে বলে সব কাজে ইজ্জত আছে। ভিক্ষা করি এটার মধ্যেও ইজ্জত আছে। বড় মেয়েটা সব সময় সিনেমা দেখে। সিনেমার গেট কিপারের সঙ্গে প্রেমও করে। 'হামিদ মিঞার ইজ্জত'-এর অভিনয় শিল্পীরা হলেন– মেহের আফরোজ শাওন, মাজনুন মিজান,

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, শামীমা নাজনীন, প্রফেসর শেলী, শিরিন আলম। আরেকটি নাটকের নাম 'নীতুর ঘরে ফেরা'। একটি দৈত্যক ঘিরে গল্পের উত্তেজনা বাড়বে। এতে অভিনয় করছেন মেহের আফরোজ শাওন, মীর সাব্বির ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। আরেকটি নাটকের নাম 'অনুসন্ধান'। একটি লোক সুইডেন থেকে দেশে আসে। গ্রামে যায়। গ্রামের চেয়ারম্যান একটি মানুষকে খুন করে। লোকটি তার অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। এই নাটকে অভিনয় করছেন আলী যাকের, মাজনুন মিজান, শারমিন, রুশো, মাসুদ আখন্দ। আরেকটি নাটকের নাম 'ভাইরাস'। এটি 'তাঁরা তিনজন' নাটকের সিক্যুয়েল। এই নাটকের অভিনয় শিল্পীরা হলেন– ডা. এজাজ, স্বাধীন খসরু, ফারুক আহমেদ, মুনমুন আহমেদ প্রমুখ। অন্য আরও একটি নাটকের কাজ হবে। নাটকটির নাম ছেলে দেখা। অভিনয় শিল্পীরা হলেন– ইরেশ যাকের, শাওন, মুনমুন আহমেদ প্রমুখ।

পুকুর ঘাটের সেট রেডি। মনিটরে চোখ রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। জুয়েল রানা বললেন, যখন ইশারা করব তখন বৃষ্টির পানি ছাড়তে হবে। এই দৃশ্যটিতে অভিনয় করলেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, শাওন ও মীর সাব্বির। তবে সংলাপ শুরু হলেও কৃত্রিম বৃষ্টির পানি পড়তে দেরি হলো।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, এই ছাগলরা ঠিকমতন বৃষ্টি ঝরাতে পারিস না।

দৃশ্যটি চূড়ান্ত করার আগে হুমায়ূন আহমেদ রিহার্সেল করে নিতে বললেন। কাজ শুরু হলো। কৃত্রিম বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টির পানিতে ভিজে একাকার শাওন ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। সাব্বির পুকুরে নেমে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। ক্যামেরাম্যান নিয়াজ মাহমুদের দৃশ্যটি করতে বেশ কষ্ট করতে হলো। কেননা পুকুরের পানিতে নেমে শট নিলেন তিনি।

শাওন বললেন, আমার আর দৈত্যের কি টু শটের দরকার?

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, তাহলে আমাকে আবার ভিজতে হবে?

মীর সাব্বির বললেন, আপনি না দৈত্য, ভিজবেন।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, গুড শট। আর লাগবে না।

পরের দৃশ্যের জন্য মাজনুন মিজান ও শারমিনকে রেডি করতে বলা হলো।

হুমায়ূন আহমেদ আবার বললেন, শুটিং কেমন লাগছে?

বললাম, ভালো লাগছে।

তিনি ফের বললেন, রাতে খেয়ে যেও। খুব মজার খাবারের আয়োজন হচ্ছে।

মাথা নাড়ালাম হ্যাঁ সূচক।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, আকাশের শট নিতে হবে না?

ক্যামেরাম্যান নিয়াজ মাহমুদ আকাশের দিকে ক্যামেরা অন করে কয়েকটি শট নিলেন। এই ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদ অনিমেষ আইচকে বললেন, তোমার খবর বলো? কেমন আছো?

অনিমেষ আইচ বললেন, ভালো। স্বাধীন খসরুকে লক্ষ্য করে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ঈদে কী কী করছ?

স্বাধীন খসরু বললেন, আপনার নাটক ছাড়াও আরও কয়েকটি নাটক করছি।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এরই মধ্যে মাজনুন মিজান ও শারমিনের একটি দৃশ্য ধারণের কাজ চূড়ান্ত হলো।

সন্ধ্যায় সময় আবার জম্পেশ আড্ডা।

গল্প শেষ হতে হতে রাত হলো। রাতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন হুমায়ূন আহমেদ।

এবার ফেরার পালা।

সবার কাছ থেকে এক এক করে বিদায় নিলাম আমরা। সব শেষে বিদায়

নিলাম হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে। তিনি বললেন, আবার এসো। মন চাইলেই চলে এসো।

নুহাশ পল্লী থেকে ফিরছি। গহিন জঙ্গলের ভেতরে আমরা। চারদিক অন্ধকার। গা ছমছম করছে। ভুতুড়ে পরিবেশ। আমাদের তাতে কোন ভয়ডর নেই। আমাদের মন পড়ে আছে নুহাশ পল্লীতে। হিমু কিংবা মিসির আলীর মতোই একজন রহস্যময় মানুষের কাছে।

শুটিংয়ের ফাঁকে আড্ডায় মগ্ন হুমায়ূন আহমেদ

মাইক্রোবাস ছুটে চলেছে ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে। বনানী, এয়ারপোর্ট, উত্তরা পেরিয়ে টঙ্গীর ওদিকটায় পৌঁছেছি। অন্যবার নুহাশ পল্লীতে একা একা যাই। এবার যাচ্ছি আনন্দধারার সম্পাদক অরুণ চৌধুরীর সঙ্গে। এ জন্য বাড়তি আনন্দ কাজ করছে। যেতে যেতে অনেক গল্প করছেন। অরুণ দার কথা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি। কথা হয় হুমায়ূন আহমেদকে নিয়েও। অরুণ দা জিজ্ঞাসা করেন, এবার নিয়ে কতবার যাচ্ছ নুহাশ পল্লীতে?

বললাম, পাঁচবার।

গল্প করতে করতে নুহাশ পল্লীর কাছাকাছি চলে যাই। গেটের কাছে যেতেই দারোয়ান দৌড়ে এসে গেট খুলে দেয়।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ি আমরা।

অপরিচিত একজনকে জিজ্ঞাসা করি কোথায় শুটিং চলছে?

তিনি জানান, পুকুরপাড়ে শুটিং চলছে।

আমরা ভেবেছিলাম নতুন সেট তৈরি করা হয়েছে। সেখানে শুটিং হচ্ছে। যাক, হাঁটতে লাগলাম পুকুরের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক তাকাই। গেটে ঢোকার পথে নারী ও শিশুর ভাস্কর্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখি। পাশেই বাঁধাই করা ছোট্ট পুকুর। তারপাশে ছোট একটি ঘর। দেখতে দেখতে পা ফেলি। এরপর দেখতে পাই চমৎকার একটি খেজুর বাগান। সেখানেও ছোট্ট একটি পুকুর। যার মধ্যে পদ্মফুল ফুটে আছে।

নতুন সেট ফালানো বাড়িটির কাছে যেতেই অরুণ দা বলেন, এটা কী?

আমি বলি, দাদা, এর ভেতরেই সেট ফালানো হয়েছে। দেড়শ বছর আগের জমিদার বাড়ির ভেতরটা বানানো হয়েছে। এর ডিজাইন হুমায়ূন স্যার নিজেই করেছেন।

একটু দাঁড়াই আমরা। বাড়িটিকে দেখি। পরে সোজা চলে যাই পুকুর পাড়ে।

পুকুর পাড়ে তখন তুমুল হইচই। প্রচুর লোকজন সেখানে। বুঝতে বাকি থাকে না 'ঘেঁটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের শুটিং ওখানেই হচ্ছে। বড় একটি ছাতার

নিচে চেয়ারে বসে আছেন হুমায়ূন আহমেদ। আমরা কাছে যাই। সালাম দিই। কেউ একজন দৌড়ে চেয়ার নিয়ে আসে। হুমায়ূন আহমেদের পাশে বসি। তিনি বলেন, কেমন আছ অরুণ?

জি ভালো। জবাব দেন।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, শটটি আবার নিতে হবে। বলেই মনিটরে চোখ রাখেন তিনি। ওদিকে একটু দূরে ক্যামেরা অন করা হয়েছে। পুকুরে একটি ছোট্ট নৌকায় পার হচ্ছে শিশুশিল্পী মামুন। যে কিনা ঘেঁটুপুত্র কমলার নাম ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাকে বেশ উচ্ছল মনে হচ্ছে।

কেউ একজন জোরে জোরে বললেন, মামুন হাসি হাসি মুখ থাকবে।

কয়েক মিনিটেই দৃশ্যটি চূড়ান্ত হয়।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, চলো ওদিকে যাই।

যেতে যেতে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, অরুণ, তোমার লীলাবতী কেমন যাচ্ছে?

ভালো। বলেন, অরুণ চৌধুরী।

জরুরিমালী?

শুটিং শেষ করেছি। আপনার জন্য সিডি করে নিয়ে এসেছি।

একটু পর অরুণ চৌধুরী জানতে চান, স্যার আপনার ছবিতে কতগুলো দৃশ্য থাকছে?

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, ৯৬টি। মোট কয়দিনে শুটিং করলেন?

১২ দিন। নুহাশ পল্লীতে ছয় দিন আর হাওর অঞ্চলে ছয় দিন।

কতভাগ কাজ শেষ হয়েছে?

ষাট ভাগ।

নুহাশপল্লীতে আর কয়দিন শুটিং করবেন?

আজই শেষ। আজ সন্ধ্যার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যাব সবাই। চলো ওখানে বসি।

গজারি গাছের নিচে চেয়ার রাখা ছিল। সেখানে বসলেন হুমায়ূন আহমেদ, অরুণ চৌধুরী। কিছু সময় পর এসে বসলেন চিত্রগ্রাহক মাহফুজুর রহমান খান ও মেহের আফরোজ শাওন।

শাওন বললেন, অরুণ দা কেমন আছেন?

একইভাবে কুশলাদি জানতে চাইলেন মাহফুজুর রহমান খান।

আমি আড্ডা পর্বে কিছু ছবি তুলতে লাগলাম। অনেক বছর পর ক্যামেরা চালানো।

একদিকে আড্ডা আর অন্যদিকে আমি নিজের ক্যামেরা নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। গাছ-গাছালির ভেতর ছোট্ট আরেকটি পুকুরে মৎস্যকন্যার ভাস্কর্য পেয়ে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না। একটি গাছের নিচে পেলাম হুমায়ূন আহমেদের ভাস্কর্য, যা দিয়েছে অন্যদিন পরিবার। ওটার ছবিও ক্যামেরায় বন্দি করলাম। ছবি তোলার পর্ব শেষ করে আড্ডাস্থলে ফিরে এলাম।

হুমায়ূন আহমেদের সহকারী এসে বললেন, স্যার সব রেডি, শট শুরু হবে।

–'চলো, বলেই উঠে গেলেন তিনি।

এই ফাঁকে অরুণ চৌধুরী বিদায় নিলেন। তাকে বিদায় দিয়ে শুটিং দেখতে গেলাম।

ভেতরে ঢুকেই দেখি সুনসান নীরবতা। মনিটরে চোখ রেখেছেন হুমায়ূন আহমেদ। একহাতে সিগারেট টানছেন। পাশে বসে আছেন মেহের আফরোজ শাওন। তিনিও মনিটরে চোখ রেখেছেন।

দৃশ্য ধারণের কাজ শুরু হলো। দৃশ্যটিতে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হলেন তমালিকা কর্মকার ও মামুন। সংলাপও দেওয়া হলো।

মেহের আফরোজ শাওন বললেন, আবার নিই। তমাল আপু আপনি তিনবার লুক দেবেন।

তাই হলো। ফের কাজ শুরু হলো। একটু সময় লেগে গেল দৃশ্যটি শেষ হতে।

দৃশ্য ধারণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, গুড।

তমালিকা কর্মকার বললেন, এবার ঠিক ছিল?

মেহের আফরোজ শাওন বললেন, হ্যাঁ।

ইউনিটের সবাই হাততালি দিলেন।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

বাইরে এসে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, খাবার রেডি করতে বল, আমি আসছি। শাওন বললেন, আমিও আসছি। আমি বললাম, স্যার কয়েকটি ছবি নেব। বললেন, নাও।

ছবি তোলা শেষ করে পেয়ে গেলাম প্রাণ রায়কে। আরেকদিকে কাঁঠাল গাছের নিচে চেয়ার রাখা ছিল। সেখানে বসে কথা বলতে লাগলাম আমি ও প্রাণ রায়।

জানতে চাইলাম, কেমন লাগছে এই ছবিতে কাজ করে?

প্রাণ রায় বললেন, ভালো। অনেক কারণেই ভালো লাগছে।

কেন বলবেন?

প্রথম কারণ হচ্ছে এটি হুমায়ূন আহমেদের মতো নামি নির্মাতা ও সাহিত্যিকের সিনেমা। কিছুদিন আগে তার পরিচালনায় প্রথম নাটকে অভিনয় করি। এখন সিনেমায় করছি। এ রকম নামি মানুষের পরিচালনায় কাজ করছি বলে প্রথমত ভালো লাগছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সিনেমাটির গল্প ভালো। দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হবে এটা মনে হচ্ছে।

আমাদের কাছে এসে বসেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। তার কাছে জানতে চাই 'ঘেঁটুপুত্র কমলা' সম্পর্কে। তিনি বলেন, হুমায়ূন আহমেদের বহু নাটক ও ছবিতে অভিনয় করেছি। এটাতেও করছি। কাজেই কাজের অভিজ্ঞতা অনেক। এটার বিশেষত্ব হলো একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে। কাজ করে খুব আনন্দ পাচ্ছি।

প্রাণ রায় ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম বেশ দূরে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আছেন তমালিকা কর্মকার। ইতিমধ্যে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। আমি সে দিকেই গেলাম কথা বলার জন্য। কাছে যেতেই তমালিকা কর্মকার বললেন, সাজু ডেইলি স্টার এনেছিস?

বললাম, এনেছি।

আনন্দধারা?

এনেছি।

দুটি পত্রিকাই দিলাম।

তোদের পত্রিকার জন্য আরেকটি ফটোসেশন করব।

বললাম, ডেট ঠিক করে জানিয়ে দিয়েন।

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তমালিকা কর্মকার বললেন, দেরি করেছিস কেন?

বললাম, রাস্তায় জ্যাম ছিল!

সকালবেলায় আমার সঙ্গে চলে আসতি?

জানিনা আপনি আছেন।

আমার প্রথম শটটি তো মিস করেছিস?

হুঁ।

অনেক সুন্দর হয়েছে। শটটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূন ভাই কেঁদে দিয়েছেন।

আপনার শুটিং শেষ কবে?

আজই আমার শুটিং শেষ।

কেমন হলো শুটিং?

ভালো। অনেক আশাবাদী ছবিটি নিয়ে।

কথা বলার সময়ে মাসুদ আখন্দ চলে এলেন। সঙ্গে মামুন। একটি ছবি তুললাম দুজনার। তমালিকা কর্মকারের ছবিও তুললাম।

তমালিকা কর্মকার বললেন, তোদের ফটোগ্রাফার কই?

আজ একটি সেশন করছে, বললাম।

মাসুদ আখন্দের মুখোমুখি হলাম। শুটিংয়ের প্রসঙ্গ তুললাম। মাসুদ আখন্দ বললেন, আমি একই সঙ্গে 'ঘেঁটুপুত্র কমলা' ছবিতে অভিনয় করছি, স্থিরচিত্রের কাজ করছি।

শুটিংয়ের মজার ঘটনা? প্রশ্ন করি।

মাসুদ আখন্দ বললেন, সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমি এই ছবিতে কাজ করার জন্য ন্যাড়া হয়েছি। ঘোড়ায় চড়া শিখেছি। আরো অনেক কিছু করতে হয়েছে।

ঘোড়াটি কোথায় পেয়েছেন?

এই দিকের এক ভদ্রলোক ঘোড়াটি দিয়েছেন শুটিং করার জন্য।

এদিকে খাবার টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ ও মেহের আফরোজ শাওন চলে এলেন। আমি, প্রাণ রায়, মাসুদ আখন্দ, মাহফুজুর রহমান খান, মাসুম রহমান, তমালিকা কর্মকার সবাই খাবার টেবিলে যোগ দিলেন। খাওয়া শুরু হলো। খাওয়া ও আড্ডা দুটিই একসঙ্গে চলতে লাগল। এক পর্যায়ে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এলেন খাবার টেবিলে। তখন তমালিকা কর্মকার ও মেহের আফরোজ শাওন মজার মজার কথা বলে ক্ষ্যাপাতে লাগলেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে।

নূহাশপল্লীতে ইফতার করছেন হুমায়ূন আহমেদ, আসাদুজ্জামান নূর, মাসুদ আখন্দ, শাহ আলম সাজু ও নিষাদ হুমায়ূন

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, অরুণ কোথায়?

আমি বললাম, দাদা চলে গেছেন। অফিসে জরুরি কাজ আছে।

মাহফুজুর রহমান খান বললেন, চলে গেছে! ইশ কতদিন অরুণদার সঙ্গে একত্রে খাই না!

মাসুদ আখন্দ বললেন, সাজু ভাইকে রেখে গেছেন?

খাবার শেষ হলো। খুব তৃপ্তি নিয়ে খেলেন সবাই। গরুর মাংস, মুরগির মাংস, ইলিশ মাছ, শিং মাছ, শৈল মাছ, সবজি ও ভর্তাসহ হরেক রকমের তরকারি ছিল। তৃপ্তি সহকারে না খেয়ে উপায় কী!

সব শেষে এল টকদই।

এরপর এল পান। হুমায়ূন আহমেদ পান খেলেন। আমি ও মাসুদ আখন্দও পান খেলাম। শুরু হলো গল্পের আসর।

বেশিরভাগ গল্পে চলে এলেন প্রয়াত সাহিত্যিক আহমদ ছফা।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, একবার কুমিল্লা গিয়েছিলাম বন্ধুর বাড়িতে। সঙ্গে ছফা ভাইও ছিলেন। আমার ওপর রাগ করে তিনি কুমিল্লা থেকে ঢাকায় হেঁটে চলে আসেন। সে কী মহাকাণ্ড!

হুমায়ূন আহমেদ আবার বললেন, আরেকবার আমি আর ছফা ভাই (আহমদ ছফা) রিকশা করে যাচ্ছি। হঠাৎ ধপাস করে রিকশা থেকে পড়ে যান ছফা ভাই। একটু পর জানতে পারি তিনি কয়েকদিন ধরে না খেয়ে আছেন। কারণ ক্ষুধার্ত একজনকে নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখবেন।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, ছফা ভাইকে নিয়ে অনেক স্মৃতি আছে। একবার তিনি একজন নামি লেখককে কড়া কিছু কথা বলে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন।

আহমদ ছফাকে নিয়ে একের পর এক গল্পের পর্ব চলতেই থাকল। একটা গল্প শেষ হয় আর আমরা সবাই হাততালি দিই।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ছফা ভাই যাতে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান এ জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম। এটা জানার পর তিনি আমাকে ধরলেন। রাগারাগিও করলেন।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, ছফা ভাই একবার খবর পেয়েছেন তসলিমা নাসরিনের বাসায় প্রখ্যাত দুজন কবি খেয়ে এসেছেন। ছফা ভাইও খেতে যাবেন। তসলিমা নাসরিন দাওয়াত দিলেন। ছফা ভাই খেতে গেলেন। গিয়ে দেখেন তসলিমা নাসরিন বাসায় নেই। খোঁজ নিয়ে জানলেন ওইদিন হাসপাতালে জরুরি কাজ থাকায় তাকে যেতে হয়েছে। ছফা ভাই রেগেমেগে অস্থির। কয়েক ঘণ্টা তসলিমা নাসরিনের মালিবাগের বাসার গেটে বসে থেকে বাসায় চলে আসেন।

একটা সময় আড্ডা শেষ হয়। তমালিকা কর্মকার বিদায় নিয়ে ঢাকা চলে

আসেন। অন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার জন্য সবকিছু গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হুমায়ূন আহমেদ ও মেহের আফরোজ শাওন বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘরে ঢুকলেন। আমিও ঢাকায় ফিরে আসব। হুমায়ূন আহমেদের ঘরে ঢুকলাম। দেখি তিনি ছোট্ট পুত্র নিষাদকে কোলে নিয়ে আছেন।

বললাম, স্যার ঢাকা চলে যাব। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, যাও, ভালো থেকো। বিদায় নিলাম মেহের আফরোজ শাওনের কাছ থেকে। এরপর প্রাণ রায় ও মাসুদ আখন্দের কাছ থেকে।

ফেরার সময় সূর্যদেব পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নুহাশ পল্লীতে পাখির কিচির-মিচির ডাক শুরু করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মিতালী করতে করতে তমালিকা কর্মকারের গাড়িতে করে ঢাকা ফিরলাম। ফিরতে ফিরতে আড্ডা হলো অনেক।

দিনভর দখিন হাওয়াতেই
ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ

১৩ নভেম্বর দিনটি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের জন্য এক বিশেষ দিন। মনে রাখার মতো একটি দিন। কেননা, এই দিনটিতে বাংলা সাহিত্যে জীবন্ত কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। এবারের জন্মদিনে সারাদিন তিনি ধানমন্ডির দখিন হাওয়ার বাসাতেই ছিলেন। সকাল থেকে বিকেল অবধি ভক্ত, কাছের মানুষের ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। অনেক সময় নিয়ে তরুণ সাংবাদিকদের সঙ্গে খোশ গল্পেও মেতে ওঠেন। আগের রাত ১২টা এক মিনিটে ঘনিষ্ঠজনদের উৎসবের শুভ সূচনা করেন। সকাল হতেই এক এক করে আসতে থাকেন সমাজের নানা স্তরের মানুষরা। কেউবা মুঠোফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সানন্দে তিনি ফোনে কথা বলেন। গুণী এই লেখকের কাছে জানতে চাওয়া হয়– জন্মদিনে কী পেলে সবচাইতে খুশি হন? এর জবাবে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, সাধারণত ফুল আর বই পেলেই বেশি খুশি হই। ফুল আর বই এই দিনে আমাকে বেশি টানে। মুগ্ধ হই। ভালো লাগে। জন্মদিন নিয়ে ভাবনা? হুমায়ূন আহমেদ বলেন, জন্মদিন মানে জীবন থেকে একটি বছর চলে যাওয়া। এতে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নাই। বরং জীবন চলে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওনের কাছ থেকে জন্মদিনে কি উপহার পেয়েছেন– এমন প্রশ্নের জবাবে নন্দিত এই কথাসাহিত্যিক জানান, গত রাতে শাওন আমাকে একটি গান শুনিয়েছে। ওটাই জন্মদিনে স্ত্রীর কাছ থেকে বড় পাওয়া। গানটি শুনে মুগ্ধ হয়েছি। অন্যদিকে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী তুমুল আড্ডায় তিনি সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র নিয়ে অনেক কথা বলেন। ধর্মীয় বিষয়ে তার এত জানা শোনা দেখে বিস্মিত হন কেউ কেউ। তিনি বলেন, ধর্ম সম্পর্কে যা জানি তা তো লেখা যাবে না। সমস্যা আছে। তবে আমি সৃষ্টিকর্তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। লেখালেখির বিষয়ে তিনি বলেন, লিখেই বেশি আনন্দ পাই আমি। আমৃত্যু এই কাজটা করে যেতে চাই। লেখালেখি নিয়ে তৃপ্ত-অতৃপ্তের প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, অবশ্যই তৃপ্ত। তৃপ্ত না থাকলে তো লেখালেখি করা যেত না। তৃপ্তি আছে

বলেই লেখালেখি করি। তৃপ্তি ও অতৃপ্তি দুটিই লাগে লেখালেখির জন্য। যার সব কিছুতেই অতৃপ্তি তার তো লেখালেখি হবে না। আবার যার সবকিছুতে তৃপ্তি তারও লেখালেখি হবে না। আমার তৃপ্তিও যেমন আছে, অতৃপ্তিও আছে। গেল বছরের মতো এবারও আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এককভাবে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে মন্তব্য– এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান লেখক, যে কিনা বহু পাঠকের কাছে নিজের রচনা নিয়ে পৌঁছাতে পেরেছি। অনেক ক্ষমতাবান লেখকরাও এই কাজটি করতে পারেন না। যদি মানুষের কাছে পৌঁছানো না যায় তাহলে লেখালেখি অর্থহীন। এ ক্ষেত্রে আমি সৌভাগ্যবান। বড় ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ছোট ভাই আহসান হাবীবের মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, জন্মদিন বলতে ছোটবেলার জন্মদিনকেই মনে হয়। তারপরও বড় ভাইয়ের জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা সবসময় থাকে। এবারও থাকল।

কথার জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ-এর জন্মদিনে ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সাংবাদিক ও লেখক শাহ আলম সাজু

এদিকে প্রত্যেক বছরের মতো জন্মদিনকে ঘিরে এবারও একটি নতুন বই বাজারে এসেছে। যার মোড়ক উন্মোচন হয়েছে পাবলিক লাইব্রেরিতে। 'ম্যাজিক মুন্সী' নামের বই বাজারে এনেছে অন্য প্রকাশ। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই মোড়ক

উন্মোচনের সময় কাছের মানুষজন নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কিংবদন্তি এই কথাসাহিত্যিক জীবনের ৬২ বসন্ত পার করে ৬৩ বসন্তে পা দিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি নেত্রকোনা জেলা কেন্দুয়ার কুতুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ূন আহমেদ শুধু কথাসাহিত্যিকই নন, জনপ্রিয় নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বিশিষ্টজনেরা বলেন, গুণী এই মানুষটি যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন তিনি। এরপর আমেরিকার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি ডিগ্রি নেন। পরে দেশে ফিরে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এক সময় শখের বশে নাটক লেখায় হাত দেন। ব্যাপক দর্শকনন্দিত নাট্যকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তার লেখা অয়োময়, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, এইসব দিনরাত্রি, সবুজছায়া ও নক্ষত্রের রাত নাটকগুলো এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে। এক সময় নাটক পরিচালনাতেও নিজের সম্পৃক্ততা ঘটান। 'আগুনের পরশমণি' দিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসেন। প্রথম চলচ্চিত্র একাধিক জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। সেই সাফল্য ধরে রাখে 'শ্রাবণ মেঘের দিন' চলচ্চিত্রও। সর্বশেষ পরিচালনা করছেন 'ঘেঁটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রটি। হিমু

ও মিসির আলীর মতো জনপ্রিয় দুই চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। অন্যদিকে নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প, কবিসহ প্রায় দুই শতাধিক বইয়ের লেখক তিনি। লেখালেখির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন। কেবল এ দেশেই তাকে নিয়ে মাতামাতি হয় না। দেশের বাইরেও তাকে নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ পাঠকের। নন্দিত এই লেখকের জন্মদিনে আনন্দধারা পরিবারের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। শতায়ু হোন হুমায়ূন আহমেদ।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের তুরুপের তাস

হুমায়ূন আহমেদ নুহাশপল্লীতে ঈদুল আজহার নাটকের শুটিং করছেন।

খবরটি শোনার পর অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক মাসুদ আখন্দকে ফোন করি। তিনি বলেন, নুহাশপল্লীতে আছি, চলে আসুন।

একটু রাগের সুরে বললাম, শুটিং শুরু হওয়ার খবর তো আমাকে জানানোর কথা? জানাননি কেন?

মাসুদ আখন্দ বলেন, বস ভুলে গিয়েছিলাম। চলে আসুন, হুমায়ূন স্যার আছেন।

আমি বলি, ওকে বস আমি এক্ষুনি আসছি।

অফিসের টুকটাক কাজ সেরে নিই। একটি রিপোর্টের অর্ধেক বাকি ছিল। রিপোর্টটি শেষ করে বেরিয়ে পড়ি। মগবাজারে গিয়ে প্রভাতী বনশ্রীর গাড়িতে উঠে বসি।

ফের ফোন করি মাসুদ আখন্দকে। ক্যামেরা আছে তো। ছবি কিন্তু লাগবে!

মাসুদ আখন্দ বলেন, অ্যাসিসটেন্টকে বলে দিচ্ছি। ও ক্যামেরা নিয়ে আসবে।

গাড়ি চলতে থাকে।

যানজটে ছটফট করতে থাকি। বেশ সময় লেগে যায় গাজীপুর হোতাপাড়া পৌঁছাতে। হোতাপাড়া পৌঁছে টং দোকানে চা খেতে বসি। জিলাপি খেতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা পূরণ না করা ঠিক নয়। জিলাপি খেয়ে নিই। একটি পান খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। চা পান আর জিলাপি খাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করেই সিএনজি চালকদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে থাকি। দেড়শ টাকা ভাড়া মিটিয়ে রওনা দিই। বাইরে প্রচ-রোদ তখন। সিএনজি চালক মেরাজ অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যায় নুহাশপল্লীর গেটে। ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই। দেখতে পাই লাঞ্চ বিরতি দেওয়া হয়েছে। সোজা চলে যাই হুমায়ূন আহমেদের কাছে। সালাম বিনিময় করতেই জিজ্ঞাসা করেন, কাজে এসেছ– নাকি বেড়াতে? আমি বলি, স্যার, অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি। আপনার নাটকের লোকেশন রিপোর্ট করব।

স্যার বলেন, ভালো। চা নাশতা খাও। লাঞ্চ করেছ? লাঞ্চ কর।

আমি মুগ্ধ হয়ে হুমায়ূন স্যারের কথা শুনি এবং স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকি। আর মনে মনে বলি– আপনার মতো মানুষ আরো বেশি বেশি দরকার এদেশে।

ফের শুটিং শুরু হয়। একটি দৃশ্যে পাগলের অভিনয় করেন ডা. এমএ করিম।

ডা. এমএ করিমের দৃশ্যটি চূড়ান্ত হওয়ার পর তার সঙ্গে পরিচিতি হই। সানন্দে তিনিও পরিচিত হন। [illegible] হয় তার সঙ্গে।

ডা. এমএ করিমের কাছে জানতে চাই– হুমায়ূন স্যারের নাটকে কি প্রথম কাজ করছেন?

ডা. এমএ করিম বলেন, না, আগেও করেছি। 'নক্ষত্রের রাত'-এ শাওনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আরো কিছু কাজ করেছি হুমায়ূন আহমেদের। এবার অনেক দিন পর হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করলাম। তিনি আরো বলেন, এবার মাহফুজ আহমেদ একটি নাটকে অভিনয়ের জন্য বলেছিলেন। আমি সময় বের করতে পারিনি।

হুমায়ূন স্যারের সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে? জানতে চাই।

ডা. এমএ করিম বলেন, হুমায়ূন আহমেদ আমার খুব ছোটবেলার বন্ধু। বগুড়ায় একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি আমরা। আমাদের তুই তোকারি সম্পর্ক।

কলেজেও একসঙ্গে পড়েছেন? আবার জিজ্ঞাসা করি।

ডা. এমএ করিম বলেন, না। হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। আমি রাজশাহীতে। পরে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি মেডিক্যালে। আবার ও এক সময় আমেরিকা চলে গেল। আমিও।

হুমায়ূন স্যারের লেখালেখির কোন দিকটি আপনার ভালো লাগে? কৌতূহল নিয়ে জানতে চাই।

ডা. এমএ করিম বলেন, হুমায়ূন আহমেদের লেখায় বাস্তব জীবনটাই উঠে আসে। কল্পনার কিছু থাকে না। এটাই পাঠককে টানে। আমারও ভালো লাগে।

বাংলা সাহিত্যের এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক আপনার স্কুল জীবনের বন্ধু, তো তাকে নিয়ে একটি স্মৃতির কথা বলুন?

তিনি বলেন, স্কুল জীবনে সিনেমা দেখতাম। একদিন আমি গেটম্যানকে বলে সিনেমা দেখতে যাই। গেটম্যানের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের বাবার দেখা হয়ে যায়। গেটম্যান বলে দেন– আপনার ছেলে সিনেমা দেখছে। আমি খালু বলতাম হুমায়ূন আহমেদের বাবাকে। খালু বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান হুমায়ূন আহমেদ বাড়িতে। এরপর হুমায়ূনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হলের ভেতরে ঢুকেন। তারপর আমাকে নিয়ে বাসায় ফেরেন। বাসায় গিয়ে হুমায়ূন আহমেদের মাকে বলেন, দেখ তোমার ছেলে কী করেছে। আমি মা বলে ডাকতাম হুমায়ূন আহমেদের মাকে। সেদিন আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। এ কথাটা খুব মনে পড়ে।

গল্প শেষ হয়।

এদিকে শুটিং শুরু হয়ে যায়।

দৃশ্যটির কাজ করা হয় নুহাশপল্লীর প্রবেশ পথের গেটে। দৃশ্যটি এ রকম– ফারুক আহমেদ গেটের নিচে চাপা পড়ে। এ নিয়ে হইচই পড়ে যায়। বাড়ির ম্যানেজার প্রাণ রায় ছুটে আসে।

ফারুক আহমেদ বলেন, ভাই আপনারা মাছির আলাপ বাদ দেন। আমার একটা ব্যবস্থা করেন।

প্রাণ রায় বলেন, চিন্তার কিছু নাই।

আলমগীর রহমান বলেন, আইজকা হইবো না। কাইল সক্কালে ব্যবস্থা একরুম।

বেশ সময় লেগে যায় দৃশ্যটি চূড়ান্ত হতে। দৃশ্যটি চূড়ান্ত হওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদ বলেন, সুন্দর হয়েছে।

আরেকটি দৃশ্য ধারণের জন্য সেট তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কয়েকজন। এই ফাঁকে আড্ডা জমে ওঠে। আবদুল্লাহ রানা, মাসুদ আখন্দ, প্রাণ রায় আড্ডা শুরু করেন।

আবদুল্লাহ রানা বলেন, নাটকটির নাম 'তুরুপের তাস'। এই নাটকে একজন প্রভাবশালী ও বিত্তশালী লোকের ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি। সত্যি কথা বলতে হুমায়ূন আহমেদের কাজ করতে এসে আমি একটু নার্ভাস।

প্রাণ রায় বলেন, এবারই প্রথম আমি হুমায়ূন স্যারের পরিচালনায় অভিনয় করছি। অনেক ভালো লাগছে। 'তুরুপের তাস' নাটকের গল্পটিও ভালো।

মাসুদ আখন্দ বলেন, আমি মজার একটি চরিত্রে অভিনয় করছি। সব সময় ম্যাজিক দেখাই।

'তুরুপের তাস' নাটকের গল্পটি কেমন?

মাসুদ আখন্দ বলেন, খুব মজার গল্প। একটি বাংলো বাড়িকে ঘিরে নানা রকম ঘটনা ঘটতে থাকবে।

রাত হয়। রাতের আকাশে জোছনা। একটি দৃশ্য শেষ হয় আর হুমায়ূন আহমেদ পায়চারি করেন। ভাবেন।

নুহাশপল্লী ছেড়ে এক সময় ঢাকায় ফেরার জন্য পা বাড়াই। চারদিক তখন অন্ধকার। ডা. এমএ করিমের গাড়িতে করে ঢাকায় ফেরা। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

গল্পে গল্পে গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হুমায়ূন আহমেদ

যাচ্ছি নুহাশপল্লীতে।

আগের রাতে কথা হয় মাসুদ আখন্দের সঙ্গে। মাসুদ আখন্দ একই সঙ্গে একজন তরুণ অভিনেতা, গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং আলোকচিত্রী। স্যারের স্নেহভাজন। তিনি জানান, রাতেই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে নুহাশপল্লীতে তিনি চলে যাবেন। কাজেই সকাল করে যেন চলে আসি।

শুক্রবার। ছুটির দিন। ঢাকা থেকে গাজীপুর হোতাপাড়ার দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। প্রভাতী বনশ্রীর গাড়িতে উঠে পড়ি টিকিট কেটে। ছুটির দিন থাকায় খুব দ্রুত পৌঁছে যাই হোতাপাড়া।

হোতাপাড়া বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি নুহাশপল্লীর বাহন পেতে। কয়েকটা সিএনজি পেলেও তারা যেতে আপারগতা প্রকাশ করে। অগত্যা টেম্পোতে উঠে বসি। রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। তাই ভাঙা রাস্তার সঙ্গে মিতালী করতে করতে পৌঁছে যাই মণিপুর বাজারে। এই টেম্পোর যাত্রা ও পর্যন্ত। এখান থেকে আরো সাত কিলোমিটার দূরে নুহাশপল্লী। চার-পাঁচটা সিএনজির সঙ্গে দরদাম করে একটিকে পেয়ে যাই। যাত্রী আমি একাই।

সিএনজি চালককে জিজ্ঞাসা করি, নুহাশপল্লী চেনেন তো?

তার চটজলদি জবাব, চিনি। আমার বাড়ি ওখানেই।

রাতে ফেরার ব্যবস্থা কী? আমি জানতে চাই।

চালক বলেন, বেশি রাতে ফিরলে কিছু পাবেন না। সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থায় চলে আসবেন। সিএনজি দ্রুত যেতে থাকে। এক বছর আগে এসেছিলাম নুহাশপল্লীতে। তখন রাস্তা কিছুটা ভালো ছিল। মজার বিষয় হচ্ছে গত বছরও রমজানে এসেছিলাম। এবারও রমজানে যাওয়া।

চালককে বললাম, সামনে বাজার পাওয়া যাবে না?

চালক বললেন, যাবে। কেন?

বললাম, ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যাটারি কিনব, বাজার পড়লেই একটু থামাবেন।

সামনে বাজার পড়ল। কয়েকটি দোকান ঘুরে একটিতে ব্যাটারি পেলাম। দোকানদার দুই টাকা কম রাখলেন। বললেন, আপনাকে দেখেই বুঝছি মেহমান। মেহমানদের কাছ থেকে টাকা বেশি রাখা ঠিক না। হেসে এবং দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে সিএনজিতে উঠে বসলাম।

যেতে যেতে চলে এলাম নুহাশপল্লীর প্রধান গেটে। চালককে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার সময় বললাম, নুহাশপল্লীটা তো গাজীপুর জেলায় তাই না?

চালক বলল, জি।

এটা কোন থানায়?

গাজীপুর সদর থানায়।

এই ইউনিয়নের নাম কী?

মির্জাপুর ইউনিয়ন।

সিএনজি নিয়ে চালক চলে গেল। প্রধান গেটের কাছে নিরাপত্তাকর্মী দাঁড়ানো। ঢুকেই আশ্চর্য ভালো লাগায় মন হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। প্রতিবারই এটা হয়। নুহাশপল্লীর চার দেয়ালের বাইরে প্রচুর গজারি গাছ। ঘুঘুর ডাক।

গেট থেকে কয়েকশ' গজ এগোলেই হুমায়ূন আহমেদের ঘর। তার সঙ্গে একটি ছোট্ট পুকুর। চিক চিক করছে তার পানি। আকেরটু দূরে বিশাল এক মূর্তি। তেজপাতা গাছের নিচে বসে মুগ্ধ হয়ে এক এক করে সব দেখতে

লাগলাম। মাসুদ আখন্দকে ফোন করতেই বললেন, ভেতরে চলে আসুন, স্যার আছেন।

তড়িঘড়ি করে ভেতরে ঢুকলাম। যে রুমটিতে হুমায়ূন আহমেদ বসে আছেন সেটি অনেক বড়। দেয়ালে টাঙানো আছে চিত্রকর্ম। একপাশে বইয়ে ঠাসা সেলফ। বড় একটি টিভি। হুমায়ূন আহমেদ বসে গল্প করছেন। তার পাশে বসে আছেন অভিনেতা ও সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর। সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। হুমায়ূন আহমেদ কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর গল্প শুরু করলেন। গল্পের এক ফাঁকে একজনকে ইশারা করলেন সবাইকে ডাকতে। এক এক করে যারা এলেন– শামীম শাহেদ, কুদ্দুছ বয়াতী, ফারুক আহমেদ, মাজনুন মিজান, মাসুদ আখন্দ এবং হুমায়ূন আহমেদের সহকারীরা। ইশারায় হুমায়ূন আহমেদ সিডিতে নাটক দিতে বললেন। সবাই মিলে নাটক দেখবেন, এ জন্যই সিডিতে নাটক দেখার আয়োজন।

নাটকের নাম 'শুক্লপক্ষ'। প্রায় তের বছর আগে বিটিভিতে প্রচার হয়েছিল শিক্ষামূলক এই ধারাবাহিকটি। হুমায়ূন আহমেদের রচনা ও পরিচালনায় 'শুক্লপক্ষ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন আসাদুজ্জামান নূর, লাকি ইনাম, মাহফুজ আহমেদ, মেহের আফরোজ শাওন, ফারুক আহমেদ, সালেহ আহমেদ, কুদ্দুছ বয়াতী, নাসির প্রমুখ। ঘরোয়াভাবে 'শুক্লপক্ষ' নাটকের একটি পর্ব দেখতে দেখতে হাসির বন্যা বয়ে গেল। না হাসার কাউকে পাওয়া গেল না। হাসতে হাসতে কেউ কেউ দম নিতে পারছিলেন না, এমনটিও হয়েছে। ছোট্ট নিষাদ আহমেদ এদিক ওদিক তাকিয়ে সবার হাসি দেখছে তখন।

নাটক দেখা শেষ হলো।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, সেট রেডি করো শুটিং শুরু করে দিই।

সহকারী পরিচালকরা দ্রুত চলে গেলেন সেট রেডি করতে। আসাদুজ্জামান নূরকে নিয়ে রওনা দিলেন পরিচালক।

সেট রেডি। ক্যামেরা রেডি। ক্যামেরার সামনে সংলাপ দেওয়ার জন্য শিল্পীরাও প্রস্তুত। দৃশ্যটিতে অভিনয় করার জন্য আসাদুজ্জামান নূর, ফারুক আহমেদ, মাজনুন মিজান একবার মনিটর করে নিলেন।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এবার ফাইনাল শট নেয়া যাক। হুইল চেয়ারের কারণে কয়েকবার লাগল শটটি চূড়ান্ত করতে। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, গুড শট। এভাবেই 'সাদাবাড়ি' নাটকের একটি দৃশ্য চূড়ান্ত হলো।

এবার অন্যদৃশ্যের জন্য আরেকটু দূরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া হলো। এই ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদ ও আসাদুজ্জামান নূরকে নিয়ে নানা প্রজাতির গাছ দেখতে গেলেন। পিছে পিছে আমি, মাসুদ আখন্দ ও জাপান প্রবাসী ড. নাসির জমাদার।

জয়তুন গাছ দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, নূর এটা জয়তুন গাছ। এই গাছ সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও বলেছেন।

ড. নাসির জমাদার বললেন, স্বর্গে এই ফুল দেখা যায়?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এই ফুলটাকে বলা হয় স্বর্গের ফুল।

মজা করে ড. নাসির জমাদার বললেন, তাহলে আমরা স্বর্গে না গিয়েও স্বর্গের ফুল দেখলাম।

হাসলেন আসাদুজ্জামান নূর। এবার পারিজাত গাছের সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন হুমায়ূন আহমেদ। পারিজাতের পাশেই বহেরা গাছ।

নিষাদকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, বহেরা ফল দেখেছি কিন্তু গাছ আগে দেখিনি।

উদয়পদ্ম গাছের কাছে গেলাম সবাই।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, উদয় ফুল গাছে এত সুন্দর ফুল ফোটে। চমৎকার দর্শনীয় ফুল! এসো আরেকটি জিনিস দেখাই? গেলাম হাড়জোড়া গাছের কাছে। অদ্ভুত রকমের গাছ। জীবনে এমন গাছ দেখিনি। এ গাছের নামও শুনিনি।

হুমায়ূন আহমেদ 'হাড়জোড়া' গাছ দেখিয়ে বললেন, এই গাছটির রস অন্ত সত্ত্বা মেয়েদের খুব কাজে দেয়। গ্রামের মেয়েদের বাচ্চা হওয়ার সময় সব চেষ্টা

যখন ব্যর্থ হয় তখন এই গাছের রস খেলে কাজে দেয়। এটা এমনই একটি পাওয়ারফুল গাছ, যা আছে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ডোজ ঠিক না থাকলে সে মারা যেতেও পারে।

একটি গাছ দেখিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এই গাছটি প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে থাকে। ছোট্ট একটি গাছে বড় বেলের মতো ফল ধরে আছে।

আসাদুজ্জামান নূরকে উদ্দেশ্য করে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এটা হচ্ছে পাহাড়ি বেল। খাওয়া যাবে না।

হাসলেন আসাদুজ্জামান নূর।

আমি বললাম, এই বেলকে টাঙ্গাইলে বলা হয় বেলী বেল। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে দেখেছি।

ড. নাসির জমাদার হাসতে হাসতে বললেন, হুমায়ূন ভাই একতারা বানানো যাবে প্যাহাড়ি বেল দিয়ে।

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, হুঁ। কাছেই কামরাঙ্গা গাছ। কামরাঙ্গা খেতে খেতে ড. নাসির জমাদার বললেন, বেশ মিষ্টি তো! অন্য একটি গাছের কাছে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, হ্যাঁ, এই তিনটাই আবার শিলাগাছ। কত ক্ষমতা এই গিলা গাছের।

গিলা গাছ দেখার পর হুমায়ূন আহমেদ গেলেন কমলার বাগানে। তিনি বললেন, বন বিভাগের বড় কর্মকর্তারা এখানে এসেছিলেন। এসে তারা দেখলেন যে, আমার এখানে যেসব গাছ আছে তার কালেকশন তাদের কাছেও নেই। তারা বীজ চাইলেন। আমরা দিয়ে দিলাম। এর পরিবর্তে তারা করলেন কী একটা কমলার বাগান করে দিলেন। এটাই ওদের করা কমলার বাগান।

গাছ দেখার পালা শেষ হলো। কমলার বাগান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, নূর চলেন শুটিংয়ের দিকে যাই।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, চলুন। যেতে যেতে তিনি একটা জায়গা দেখিয়ে বলেন, এখানে বড় একটি ঘর ছিল। আমরা এটাতেই আগে এসে থাকতাম। তখন এসব ছিল না। একরাতে আমরা সিলেট যাই। ওই রাতেই ঘরটি দুর্বৃত্তরা পুড়িয়ে দেয়।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, নূর এটা হলো বকফুল গাছ। বকফুল ভাজি অনেক টেস্ট!

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, কতদিন বকফুল খাই না! কোথায় পেলেন বকফুল গাছ?

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, সংগ্রহ করেছি। এটার বড়া খাওয়ার স্বাদই আলাদা।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আমার ছেলেবেলায় নীলফামারীতে বকফুল খেয়েছি। তারপর আর খাইনি।

যেতে যেতে আসাদুজ্জামান নূর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী বন্য পাখিগুলো ছেড়ে দিয়েছেন?

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, হ্যাঁ।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আপনার এখানে এমনিতেই চতুর্দিকে বন। বন্য পাখি ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। পাখিদের অভয়ারণ্য হয়ে যাবে।

ড. নাসির জমাদার বললেন, কামরাঙ্গা খাবে কে কে?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, সবাইকে দাও?

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, সাজু তো রোজা রেখেছে।

তেঁতুল গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। হুমায়ূন আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম, স্যার এটা কী তেঁতুল গাছ?

হুমায়ূন আহমেদ হাসলেন। বললেন, কী ব্যাপার তুমি তেঁতুল গাছ চেন না?

আমি বললাম, স্যার চিনি। গ্রামে দেখেছি।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এগুলো তেঁতুল গাছ। মজার ব্যাপার হলো কয়েকটি আবার মিষ্টি তেঁতুল গাছ। থাইল্যান্ড থেকে এনেছি। জানি না এখানে মিষ্টি হবে কি না।

কামরাঙ্গা খেতে খেতে মাসুদ আখন্দ বললেন, কী ব্যাপার নাসির ভাই, আমার কামরাঙ্গা তো মিষ্টি না!

ড. নাসির জমাদার হাসতে হাসতে বললেন, শত্রুতা করে আপনাকে টকটা দিয়েছি।

এদিকে শুটিং শুরু হলো। হুমায়ূন আহমেদ মনিটরের সামনে চোখ রাখলেন। দৃশ্যটিতে অভিনয় করার জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন আসাদুজ্জামান নূর, কুদ্দুছ বয়াতী, শামীম শাহেদ, মাজনুন মিজান।

দৃশ্যটি এ রকম : আসাদুজ্জামান নূর হুইল চেয়ারে বসে আছেন। বসে বসে কুকুরকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাজনুন মিজান, হঠাৎ সেখানে ঢুকবে কুদ্দুছ বয়াতী, তার দল ও শামীম শাহেদ। প্রথমবারে দৃশ্যটি চূড়ান্ত হলো না।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, কুদ্দুছ তুমি হেঁটে হেঁটে আসবে?

আসাদুজ্জামান নূর বললেন, ক্যামেরা কী কুকুরটাকে পাবে?

কুদ্দুছ বয়াতী বললেন, স্যার আমি কী সালাম দেব?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, না।

শামীম শাহেদ বললেন, স্যার আমি সালাম দেব?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, হ্যাঁ, শামীম তুমি সালাম দেবে।

ক্যামেরা অন হলো।

কিন্তু দৃশ্যটি হলো না। কুকুরটা হঠাৎ দৌড় দিয়ে চলে গেল। সবাই কুকুরটাকে ডাকতে লাগলেন। কুকুর এলো না।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, বোবা প্রাণীকে মেরো না। মারলে এরা কথা শোনে না।

অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে কুকুরটাকে আনা হলো।

ফের দৃশ্যটির কাজ শুরু হলো। কিন্তু বারবার কুদ্দুছ বয়াতীর কারণে দৃশ্যটি চূড়ান্ত করতে দেরি হতে লাগল। কুদ্দুছ বয়াতী বারবার এমএ পাসের জায়গায় বলতে লাগলেন আইএ পাস।

ক্যান্সার চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর নূহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদ

এ নিয়ে হাসি ধরে রাখতে পারল না কেউ।

এভাবে বেশ কটি দৃশ্যের কাজ হলো। ইফতারের ৩০ মিনিট আগে 'সাদাবাড়ি' নাটকটির শুটিং আপাতত শেষ হলো।

শুটিং শেষে হুমায়ূন আহমেদের কাছে 'সাদাবাড়ি' নাটকটি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ইনকাম ট্যাক্স যাতে মানুষ দেয় সে জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানোর মতোই একটি নাটক এটি।

ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। হুমায়ূন আহমেদ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে বসে পড়লেন। মাগরিবের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ইফতার করতে শুরু করলাম।

অবশেষে রাতের বেলা ফের শুটিং শুরু হলো। দৃশ্যটিতে অভিনয় করলেন আসাদুজ্জামান নূর।

যখন নুহাশপল্লী ছেড়ে চলে আসব তখন রাত সাড়ে ৯টা। বিদায় নিতে গেলাম হুমায়ূন আহমেদের কাছে। তিনি বললেন, সাবধানে যেও। আর ভালো থেকো। সময় পেলে চলে এসো নুহাশপল্লীতে।

মনে পড়ল এক বছর আগে রাতের বেলা বিদায় নেয়ার সময় এই কথাটিই বলেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ।

আস্তে করে পা বাড়ালাম। রাতের নির্জনতা ভর করল। নুহাশপল্লী ছেড়ে যতই দূরে চলে আসতে লাগলাম ততই মন পড়ে রইল নুহাশপল্লীতে।

পাদটীকা : ড. নাসির জমাদার সে রাতে ঢাকা ফিরে এলেন। তার গাড়িতে করেই ঢাকায় ফেরা। ফেরার পথে বেশিরভাগ গল্পই হলো হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে।

হুমায়ূন আহমেদ-এর সঙ্গে শেষ দেখা

রবিবার। সকাল ৯টা। ১৩ মে ২০১২। নুহাশ পল্লী যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্টের বাস কাউন্টারে টিকেট কেটে অপেক্ষা করছি। টিকেট কাটার ৪০ মিনিট পরও বাসের দেখা নেই। প্রচ- গরমে অবস্থা কাহিল। পরে বাস এলেও সিট না পাওয়ায় এয়ারপোর্ট থেকে হোতাপাড়া পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার রাস্তা দাঁড়িয়েই যেতে হলো।

কষ্টটা চাপা রেখে এক ধরনের উত্তেজনা নিয়েই পথচলা অব্যাহত থাকে। কারণ একটাই– এদেশের কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হবে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল নুহাশ পল্লীতে। আবার সেখানে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

হুমায়ূন আহমেদ ক্যান্সার চিকিৎসা শেষ না করেই দেশে ফিরেছেন। তবে মাত্র ২০ দিনের জন্য। মুঠোফোনে কথা হয়েছে নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার বুলবুলের সঙ্গে। তিনি বলেছেন, রবিবারের মধ্যেই নুহাশ পল্লীতে আসতে হবে দেখা করতে চাইলে। কারণ ওইদিন রাতেই লেখক চলে আসবেন ঢাকায়। যে কারণে দ্রুত যাওয়া।

হোতাপাড়া নেমে ম্যানেজার বুলবুলকে কয়েকবার ফোন দিই। ফোন রিসিভ না করাতে হতাশ হই। মনে মনে ভাবি হুমায়ূন আহমেদ ঢাকায় চলে গেলেন না তো?

হোতাপাড়া থেকে যেতে হবে সিএনজি করে। এক বছর আগে যেখানে ভাড়া ছিল ১শ টাকা সেখানে সিএনজি চালক ভাড়া হাঁকলেন ২শ টাকা। শেষে দেড়শ টাকায় রফা। মনে মনে ভাবি, আহারে এভাবে যদি কাজের পারিশ্রমিকও বাড়ত।

অনেকটা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে সিএনজি। ড্রাইভারকে বলি, ভাই যত দ্রুত পারেন চালান। বেচারা আধা ঘন্টার মধ্যে আমাকে নুহাশ পল্লীর গেটে নিয়ে গেলেন।

নুহাশ পল্লীর ভেতরে ঢুকেই ম্যানেজারকে ফোন করি। তিনি জানান, হুমায়ূন স্যার পুকুর পাড়ে আছেন, চলে আসেন।

জোরে জোরে পা ফেলে পৌঁছে যাই পুকুর পাড়ে। সেখানে গিয়ে দেখি মাছরাঙা টিভি ও চ্যানেল আইকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ।

টিভি চ্যানেলের কাজ শেষ হলে কাছে গেলাম। কাছে গিয়ে সালাম দেয়ামাত্রই আগের মতো স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন, কেমন আছ?

বললাম, ভালো।

ফের বললেন, চলো গাছের নিচে বসি। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে আছি।

গাছের নিচে সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়লেন। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, কত দিন এই ঘাসের ওপর বসি না। ইশারায় বসতে বললেন। সঙ্গে ছিল সন্তান নিষাদ ও নিনিদ। তাদের উদ্দেশ করে বললেন, ওদিকে যেও না বাবারা, ওদিকে ভূত থাকে।

শাওনকে উদ্দেশ করে বললেন, নিনিদকে ভেতরে নিয়ে যাও। রোদ সহ্য করতে পারবে না।

শাওন বললেন, তাই ভালো। ওখানে তো প্রচণ্ড শীত ছিল। এখন গরম সহ্য হবে কী করে?

ঘাসের ওপর বসে কি এক অনির্ণেয় উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক তাকালেন হুমায়ূন আহমেদ। আমার স্থিরদৃষ্টি তাঁর দিকে। সেই প্রাণবান মানুষটি চেহারায় পরিবর্তন এসেছে অনেক। মাথার সেই আগের ঘন চুল নেই তাঁর। চুল কমে

গেছে। অনেক পাতলা হয়ে গেছে মাথা। কেমন কালো হয়ে গেছে শরীরের রং। হয়তো এত ক্যামো নেয়ার কারণে রংয়ের মলিন ভাব। তবে চেহারায় নেই বিষণ্নতা। নেই ক্লান্তি। প্রচণ্ড সাহসী এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সাহস তার আছে বোঝা গেল। আগের মতোই চাহনির তীক্ষ্ণতা।

নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার এবং আরো কয়েকজন কর্মচারী কাছে গেলেন। তাদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র। হুমায়ূন আহমেদ সেসব হাতে নিলেন এবং একটার পর একটা দেখে বললেন, এসব হচ্ছে নানা রকমের গাছ-গাছালির বীজ। এবার নিয়ে এসেছি।

নুহাশ পল্লীর এক কর্মচারী বললেন, স্যার এগুলো কি আমাদের এখানে হবে?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, আগেরবার হয়নি কিন্তু এবার হবে। ভালো মতো পরিচর্যা করলেই হবে।

এরই মধ্যে বেশ কজন চলে এলেন হুমায়ূন আহমেদের কাছে। তারা সবাই হুমায়ূন আহমেদের গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। কেউ কেউ এসে হুমায়ূন আহমেদের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। কেউ হ্যান্ডশেক করলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন অভিভাবক। তিনি হুমায়ূন আহমেদের কাছে বসলেন। বললেন, তুমি কেমন আছ?

ভদ্রলোকটির পা ছুঁয়ে সালাম করলেন হুমায়ূন আহমেদ। সবাইকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, ইনি আমার চাচা। একমাত্র জীবিত চাচা। চাচার চোখ দিয়ে তখন ছলছল করে পানি পড়ছে। এবার হুমায়ূন আহমেদ বললেন, চাচা আপনি দোয়া করেছেন তাই তো আমি বেঁচে আছি। আপনার দোয়া কি বিফলে যেতে পারে? –উপন্যাসের হৃদয়-ছোঁয়া সংলাপের মতো শোনাল তাঁর কথাগুলো।

চাচা বললেন, কতদিন থাকবে?

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, ২০ দিন থাকব। এবার গিয়ে অপারেশন করতে হবে।

ম্যানেজার বুলবুলকে বললেন, সবাইকে ভালো মতো খাবার দেবে, কেউ যেন না খেয়ে যেতে না পারে।

প্রিয় নূহাশ পল্লীর গাছ দেখছেন হুমায়ূন আহমেদ

ঘরের ভেতরে ফেরার জন্য হাঁটতে শুরু করলেন হুমায়ূন আহমেদ। পেছন পেছন আসছেন সবাই। নেত্রকোনা শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

উদ্দেশ্য করে বললেন, আরো ভালো রেজাল্ট করতে হবে। না হলে সবাইকে আমি কী করে বলব এটা আমার স্কুল। গণমাধ্যমকর্মীদের হুমায়ূন আহমেদ বললেন, স্কুলটি স্কটল্যান্ডের স্কুলের আদলে করা। ডিজাইন করেছেন শাওন।

ঘরের ভেতর যাওয়ার আগে একটি গাছের কাছে এলেন। একটি পাতা ছিঁড়ে মুখে দিলেন। সবাইকে খেতে বললেন। এরপর সবাই এক এক করে পাতা খেলেন। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, অবিকল পানের মতো স্বাদ, কিন্তু পান নয়। আরো কয়েকটি গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। মাছরাঙা টিভির রিপোর্টারকে বললেন, তুমি পুকুরের নাম জানতে চেয়েছিলে না? পুকুরের নাম হচ্ছে লীলাবতী।

শাওন বললেন, পুকুরটি আমার মেয়ের নামে।

আমি হুমায়ূন আহমেদকে ডেইলি স্টার পত্রিকার একটি কপি দিলাম। সেখানে নুহাশপল্লী নিয়ে রিপোর্ট করেছিলাম। পত্রিকাটি দেয়ার সময় বলি স্যার আমি ডেইলি স্টারে জয়েন করেছি। স্যার খুশি হয়ে বলেন, খুব ভালো করেছো।

সবাইকে দুপুরের খাবার খেতে বলে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন হুমায়ূন আহমেদ। ড্রয়িংরুমে কার্পেটের ওপর বসলেন। তখন শাওন অন্যপ্রকাশের কর্ণধার মাজহারকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনারা লেখককে বোঝান। এভাবে যদি ঘোরাঘুরি করেন আর সবার সঙ্গে কথা বলেন তাহলে সমস্যা হতে পারে।

বাইরে তখন ভয়াবহ গরম। তরমুজ চলে এলো। সবাই তরমুজ খেতে লাগলেন। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা আর কি।

নিজের বেডরুমে যাবেন হুমায়ূন আহমেদ। ডাকলেন মাজহারকে। ছিলেন শাকুর মজিদ। তাকেও ডাকলেন। ডাক পেয়ে আমিও হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে ভেতরে চলে যাই।

ড্রয়িংরুমে গিয়ে সোজা বসে পড়লেন মেঝেতে। একটা কার্পেটের ওপর বসে পড়ে সবাইকে বসতে বললেন। সবাই বসার পর হুমায়ূন আহমেদ বললেন, দেখ তো জিনিসটা কেমন? জানো এটা গরুর চামড়া দিয়ে বানানো হয়েছে। একেবারে গরুর মতোই লাগছে। শুধু পা কাটা। বাকি সবই আছে। তারপর বললেন, এই একটা জিনিসই আমেরিকা থেকে কিনে এনেছি। দাম যেন কত শাওন?

শাওন হাসলেন।

এবার দুপুরের খাবার দেয়া হলো সবাইকে। দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ।

সন্ধ্যার দিকে ঘুম থেকে উঠলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রবীণ অভিনেতা সালেহ আহমেদ। যিনি হুমায়ূন আহমেদের বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। অন্তরঙ্গ সময় কেটেছে তাদের নাটক-সিনেমার শুটিংয়ের সময়।

দুজনের দেখা হওয়ার পর এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হলো।

একমাত্র জীবিত চাচা ও অন্যান্যদের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নুহাশ পল্লীর বাইরে চলে এলাম সবাই। দূরের গ্রামে সন্ধ্যা নেমেছে। তখনো ঘন হয়ে ওঠেনি আঁধার। আঁধারই কি জীবনের শেষ ঠিকানা? হুমায়ূন আহমেদকে দেখে তা মনে হয়নি। এই সাহসী মানুষটিকে দেখে মনে হয়েছে তিনি যেন আলোর পথের যাত্রী।

পাদটীকা : সেদিন ছিল ১৩ মে, ২০১২। হুমায়ূন আহমেদের সাথে শেষ দেখা ও শেষ কথা হয় সেদিনই।

এখন আমার জন্মদিনটা আমারই হাতছাড়া হয়ে গেছে
–হুমায়ূন আহমেদ

হেমন্তের সকালে : হেমন্তের সুন্দর সকাল। মিষ্টি রোদ তখন স্পর্শ করেছে গণগ্রন্থাগার চত্বর। সকাল সাড়ে দশটা ছুঁইছুঁই করছে। ওই সময়ে খোলা আকাশের নিচে বসে আছেন বাংলা সাহিত্যের এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা। যেখানটায় বসে আছেন তার একপাশে বইমেলার আয়োজন। সেখানে হঠাৎ এলো ব্যান্ডপার্টি। এলো হলুদ পোশাক পরে বেশ কজন তরুণ। একই সঙ্গে বাজনা ও করতালির সঙ্গে শোভাযাত্রা করে তারা শুভেচ্ছা জানায় হুমায়ূন আহমেদকে। হেমন্তের সকাল আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, হুমায়ূন আহমেদ-এর ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী বইমেলা। তাও আবার শুধু হুমায়ূন আহমেদের একক বইমেলা।

৬১তম জন্মদিনে ৬১টি রঙিন বেলুন : তিন দিনের বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদ-এর ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে ৬১টি রঙিন বেলুন উড়ানো হয়। বইমেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তৃতা করেন মা আয়েশা ফয়েজ, সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী, সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, রাশেদা কে চৌধুরী, ডা. মোহিত কামাল, যুগান্তর-এর নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম, কবি হাসান হাফিজ, অভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী মেহের আফরোজ শাওন, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। আর অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বাংলা সাহিত্যের আরেক জনপ্রিয় সাহিত্যিক ইমাদাদুল হক মিলন।

অন্যকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি : নিজের বই নিয়ে আয়োজিত বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদ বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পেতে এবং অন্যকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি। কিন্তু জন্মদিনের মতো এ ধরনের অনুষ্ঠান অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, সমাগত অতিথিদের দেখে ভালো লাগছে। ভালো লাগছে

হিমুদের দেখে। মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, মা আমাকে এই বুড়ো বয়সে কষ্ট করতে নিষেধ করেন। মা বলেন, আর কত কষ্ট করবি। আমি বলি, লেখালেখিই তো আমার বিশ্রাম। আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই লেখালেখি চালিয়ে যাব। ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দনও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, বাইরে যাব মরতে। থাকব আমি গর্তে। ঘরের ভিতর থাকতে ভালো লাগে, ওখানেই লেখালেখি করতে ভালো লাগে।

জন্মদিনে দুপুরের খাবার খাচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ

কাঠপেন্সিলের মোড়ক উন্মোচন : ৬১তম জন্মদিনকে ঘিরে বইমেলায় মোড়ক উন্মোচন করা হয় আত্মজৈবনিক নতুন বই 'কাঠপেন্সিল' এর। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন খ্যাতিমান কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন। রাবেয়া খাতুন মোড়ক উন্মোচন শেষে বলেন, শতায়ু হোক হুমায়ূন আহমেদ। লেখালেখির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে চিরস্থায়ীভাবে সে বেঁচে থাকুক। মা আয়েশা ফয়েজ বলেন, সব মায়ের কাছে সন্তানের সাফল্য ভালো লাগে। আমার ছেলের সাফল্যে আমি প্রচণ্ড খুশি।

ফুলে ফুলে সুরভিত দখিন হাওয়া : সকাল থেকেই হুমায়ূন আহমেদকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে তার ধানমন্ডির বাড়ি দখিন হাওয়ায় ছুটে আসেন আত্মীয় স্বজন ও ভক্ত অনুরাগীরা। বিকাল পর্যন্ত দখিন হাওয়ার একটি কক্ষ ফুলে ফুলে ভরে যায়। ছড়ায় ফুলের সৌরভ। ফাঁকে ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদ

জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। জন্মদিনের কেক খেতে বলেন সবাইকে।

বারোটা এক মিনিট : জন্মদিনের আগের রাতের ঘটনা। রাত তখন বারোটা বেজে এক মিনিট। দখিন হাওয়ায় একে একে ততক্ষণে চলে এসেছেন অনেকেই। এসেছেন বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, কণ্ঠশিল্পী এসআই টুটুল, অভিনেতা স্বাধীন খসরু, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, প্রকাশক আলমগীর হোসেন, সিরাজুল চৌধুরী কমল, হুমায়ূন আহমেদ-এর মা আয়েশা ফয়েজ, স্ত্রী শাওন প্রমুখ। সবাই মিলে আনন্দঘন পরিবেশে জন্মদিনের কেক কাটেন। ওই সময় জুয়েল আইচ বলেন, হুমায়ূন আহমেদ-এর মধ্যে জাদুকরী কিছু আছে। মা আয়েশা ফয়েজ বলেন, আমি তো চিন্তাও করিনি আমার ছেলেকে এতো মানুষ পছন্দ করবে, এত শ্রদ্ধা করবে। কেক কাটার পর এক প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, আমি চাচ্ছি নুহাশ পল্লীতে কবর হবে আমার। সমস্ত সবুজের ভেতর সাদা কবর। একটি এপিটাফে লেখা থাকবে। এপিটাফটা কিন্তু আমি নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। আমি সারা জীবনই তাঁর কাছ থেকে ধার করেছি। আমি এপিটাফের লেখাটাও ধার করেছি। সেখানে লেখা থাকবে– চরণ ধুলিতে দিওগো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে। জন্মদিনের প্রথম প্রহরে অনেকের সঙ্গে এসেছিলেন চ্যানেল আইয়ের ক্ষুদে গানরাজদের অনেকে।

পাক্ষিক আনন্দধারার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে হুমায়ূন আহমেদকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শাহ আলম সাজু

ভোজনপর্ব : জন্মদিনের দিন দুপুরের ভোজনপর্বের আয়োজন করা হয় প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের বাসায়। দখিন হাওয়ার পাশে ফ্ল্যাটটি অবশ্য মাজহারুল ইসলামের। ভোজন পূর্বে অংশ নেন হুমায়ূন আহমেদ, শাওন, ভাই আহসান হাবীবসহ অনেকেই। ভোজন পর্ব চলাকালে আসেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর। তাকে কাছে পেয়েই শাওন বলেন, নূর চাচা এসেছে, নূর চাচাকে খেতে দেন। আসাদুজ্জামান নূর খেয়ে আসার কথা জানালে শাওন বলেন, এমপি সাহেবকে খাওয়ানো মিস করলেন। খাবার শেষে হুমায়ূন আহমেদ ও আসাদুজ্জামান নূর খোশগল্পে মেতে ওঠেন। ভোজনপর্বে সবাইকে অ্যাপায়ন করেন প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম ও তার স্ত্রী স্বর্ণা।

জন্মদিনে মা, বোন, ভাই ও স্ত্রীর সাথে হুমায়ূন আহমেদ

শাওনের কথা : অভিনেত্রী ও গায়িকা শাওন বলেন, আমি এবার কোনও উপহার দিইনি জন্মদিনকে কেন্দ্র করে। আমার দেওয়া উপহার যদি এক্সট্রা কিছু না হয় তাহলে কেন দিব? শার্ট, পাঞ্জাবি,এটা তো সবাই দেয়। একবার একটি ক্যালে-ার দিয়েছিলাম। তবে এবার একটা ইচ্ছা ছিল। আমার থিসিস-এর কারণে করতে পারিনি। আমার ছেলে নিষাদ গান গাইতে পারে। মা'র কাছে সন্তানের সব কিছুই সুন্দর। নিষাদের গানের মুড যখন আসে তখন ওর কিছু কিছু গান আমি রেকর্ডারে রেকর্ড করে রাখি ছোট্ট রেকর্ডারে। ও তো আর মাইক্রোফোনের সামনে যায় না। রেকর্ড করেছিলাম এবং আমি ভেবেছিলাম

এসআই টুটুলকে দিয়ে ওই গানের মাঝখানে মিউজিক বসিয়ে একটা পার্সোনাল সিডি হুমায়ূন আহমেদ-এর জন্মদিনে দিব, বাজারে ছাড়ার জন্য না। বাবা-মা'র জন্য তাদের আড়াই বছরের ছেলের সিডি একটা বিশাল ব্যাপার। ওটাই করার ইচ্ছা ছিল। থিসিস-এর জন্য পারিনি। কারণ মিউজিকটা করার জন্য একটা সময় তো দরকার।

জন্মদিনে মায়ের সাথে হুমায়ূন আহমেদ। পাশে সাংবাদিক সাজু

জন্মদিনেও লেখালেখি : জন্মদিনের দিনটাতেও লেখালেখি করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর স্ত্রী শাওন বলেন, বাচ্চাদের উপন্যাসের একটি পর্ব আজ লিখেছে। রাক্ষস খোক্কস এবং ভোক্কস বইয়ের একটি পর্ব জন্মদিনের দিনেই লিখেছে। বইটি এবার বইমেলায় আসবে। এছাড়া শাকুরের মজিদের জন্মদিনের স্মরণিকা বের হবে। সেটার জন্য একটি লেখা জন্মদিনের দিনই লিখেছেন।

সবশেষে নুহাশ পল্লীতে : এবারই প্রথম হুমায়ূন আহমেদ-এর জন্মদিনকে ঘিরে জনপ্রিয় এই লেখকের দাদার ও নানার পরিবারের আত্মীয় স্বজনরা ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায় বেড়াতে আসেন। এজন্য বাড়তি আনন্দ ছিল দখিন হাওয়া জুড়ে। আত্মীয়-পরিজন নিয়ে ওইদিন বিকালের দিকে পৌছে যান নুহাশ পল্লীতে। সঙ্গে ছিলেন অন্যদিন-এর প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম। সেখানে এসে পৌছেন বাউল শিল্পী ইসলাম উদ্দিন বয়াতি। নেত্রকোনার এই শিল্পীও চলে

আসেন ঘটা করে। তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত নুহাশ পল্লীতে চলে গান বাজনা।

এবং জাহিদ হাসান : হুমায়ূন আহমেদ-এর নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জাহিদ হাসান কতটা দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছেন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশেষ করে নাটক। একটা সময়ে হুমায়ূন আহমেদ-এর নাটকে নিয়মিত ছিলেন তিনি। জন্মদিনের দিন নুহাশপল্লীতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে শুভেচ্ছা জানান জাহিদ হাসান। সেখানে গিয়েছিলেন অভিনেতা মাজনুন মিজানও।

পাদটীকা : নন্দিত লেখকের জন্মদিনে বেশখানিকটা সময় ছিলাম দখিন হাওয়ায়। পেশাগত কারণেই হুমায়ূন আহমেদের বাসায় যাওয়া। সেদিন দুটি বই তিনি উপহার দিয়েছিলেন। সবশেষে তাঁর একটা সাক্ষাৎকারও নিই।

আমি সৌভাগ্যবান লেখক
–হুমায়ূন আহমেদ

আনন্দধারা : লেখালেখি নিয়ে কতটা তৃপ্ত?

হুমায়ূন আহমেদ : তৃপ্ত তো বটেই। তৃপ্তি না থাকলে তো লেখালেখি করা যেত না। তৃপ্তি আছে বলেই লেখালেখি করি। তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি দুটিই লাগে লেখালেখির জন্য। যার সব কিছুতে অতৃপ্তি তার লেখালেখি হবে না। আবার যার সব কিছুতে তৃপ্তি তারও লেখালেখি হবে না। আমার তৃপ্তিও যেমন আছে তেমন অতৃপ্তিও আছে।

আনন্দধারা : জন্মদিন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য?

হুমায়ূন আহমেদ : জন্মদিন সম্পর্কে আমি মনে করি এটা পারিবারিকভাবে করা উচিত। যেখানে আত্মীয় স্বজনরা থাকবে। ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ থাকবে। কিন্তু এখন জন্মদিন আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছুই আমি জানি না। প্রকাশকরা কখন কেক নিয়ে আসবেন তাও জানি না। আবার বিকালে নুহাশপল্লীতে যাব, সেখানে কি হবে তাও জানি না। সবকিছুই আমার কাছে রহস্যের মতো করে রাখা হয়েছে। যাতে আমি আনন্দটা পাই। কাজেই এক অর্থে বলা যেতে পারে জন্মদিন আমার হাত ছাড়া।

আনন্দধারা : আপনার লেখায় মধ্যবিত্তের বিষয় বেশি পাই?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র এক্সপেরিমেন্ট না করে কিছু করতে পারে না। এখন আমি মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। কাজেই ওই সমাজটাকে আমি ভালোমতন জানি। আমি তো কখনও বস্তিতে গিয়ে জীবনযাপন করি নাই। আমি কল্পনা করে লেখার মানুষ না। আমি যেটা দেখি সেটাই লিখি। আরেকটি বিষয় বলি– আমি মধ্যবিত্ত নিয়ে লিখছি নাকি উচ্চবিত্ত নিয়ে লিখছি সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। একজন লেখক ছিলেন তিনি সারাজীবনই রাজা বাদশা এবং রাজকন্যা নিয়ে লিখে গেছেন। তিনি শেক্সপিয়ার। কোনও সমস্যা হয়েছে তার? তিনি তো কুলি মজুর নিয়ে লেখেন নিই। তিনি সারাজীবনই লিখেছেন রাজা বাদশা এবং রাজকন্যাদের গল্প। এটা নির্ভর করে লেখকের ক্ষমতার ওপর। যদি লেখক খুব ক্ষমতাবান

হন। তিনি মধ্যবিত্তের ওপরই সমস্ত মানবিক আবেগ, দুঃখ বেদনা, লাঞ্ছনা, গ্লানি নিয়ে আসতে পারেন। লেখকের যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে হবে না।

আনন্দধারা : মিসির আলী বিষয়ক কোনও লেখা অচিরেই পাওয়া যাবে কি?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি সব সময় তো মিসির আলীকে নিয়ে লিখি। আমি নিশ্চিত সামনে মিসির আলী বিষয়ক লেখা আসবে। আর আমি খুব পরিকল্পনা করে কিন্তু লিখি না। অনেক চিন্তাভাবনা করে লিখতে বসা হয় না। আমি স্বতঃস্ফূর্ত ধারার লেখক। যেটা মাথায় আসে সেটাই লিখি। যেটা মাথায় আসে না জোর করে ধরে এনে লিখি না।

আনন্দধারা : ৬০টি বছর পার করলেন, জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণা বা উপলব্ধি কি?

হুমায়ূন আহমেদ : জীবন সম্পর্কে আগেও কিছু বুঝতে পারিনি, এখনও বুঝতে পারি না।

আনন্দধারা : জন্মদিন উপলক্ষে আপনার বই নিয়ে একক বইমেলা হচ্ছে। সেখানে প্রচুর লোক সমাগম, সে সম্পর্কে যদি বলেন?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান লেখক, যে কিনা বহু পাঠকের কাছে নিজের রচনা নিয়ে পৌছাতে পেরেছি। অনেক ক্ষমতাবান লেখকরাও এই কাজটি করতে পারেন না। যদি মানুষের কাছে পৌছানো না যায় তাহলে লেখাটা তো অর্থহীন। এক্ষেত্রে আমি সৌভাগ্যবান।

হিমু দিবসে নেই হুমায়ূন আহমেদ

বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় এক কথাশিল্পী। কেবল কথাসাহিত্যেই তার আকাশছোঁয়া সাফল্য ছিল না, নাট্যকার হিসেবেও তিনি ছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয়। আবার সিনেমা পরিচালনা করেও চমক সৃষ্টি করেছেন। তার সমালোচকরাও স্বীকার করেন যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা তুলে এনেছেন।

কথার জাদুকর বলা হয় নন্দিত নরকের এই লেখককে। নন্দিত নরকে ও শঙ্খনীল কারাগার লিখে অল্প দিনে পাঠক মহলে সাড়া ফেলেন তিনি। প্রতিবছর ছিল তার জন্মদিনে নজরকাড়া আয়োজন। এবারই প্রথম জন্মদিনে নেই হুমায়ূন আহমেদ। না ফেরার দেশে চলে গেছেন তিনি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিনটিকে এবার ঘোষণা করা হয় হিমু দিবস হিসেবে। চ্যানেল আই কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় হুমায়ূন মেলার। দিনভর সেখানে গান, নাচ, স্মৃতিচারণ, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা চলে। আর সবাই হুমায়ূন মেলায় হলুদ পাঞ্জাবি পরে উদ্‌যাপন করেন হুমায়ূন মেলা।

১৩ নভেম্বর ছিল হুমায়ূন আহমেদের ৬৪তম জন্মদিন। জীবদ্দশায় তার ধানমন্ডির দখিন হাওয়ার বাসভবনে আগের দিন রাত থেকেই কাছের মানুষরা ভিড় করতেন। রাত বারোটা এক মিনিটে কেক কাটা হতো। দিনের বেলা সংবাদকর্মীদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে কথা বলতেন। দিতেন ফটোসেশনের সময়। নানা বিষয় নিয়ে গল্পে মেতে উঠতেন জন্মদিনে।

২০১০ সালে সর্বশেষ ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায় জন্মদিন পালন করেন হুমায়ূন আহমেদ। অসম্ভব আড্ডাবাজ ছিলেন। নানা বিষয়ে জ্ঞান ছিল তার। কথার জাদুকর শুধু বইয়ে কথা লিখেই মুগ্ধ করেননি কোটি পাঠককে, একই সঙ্গে বৈঠকি আড্ডায়ও মুগ্ধ করতেন শ্রোতাদের।

একটা সময়ে এসে ছবিও আঁকা শুরু করেন। দখিন হাওয়ার একটি ছোট্ট রুম ছিল তার, যেখানে ছবি আঁকতেন। তার লেখা গানও ব্যাপক জনপ্রিয়। তার সৃষ্ট হিমু চরিত্রটি বহু তরুণকে ভেতর জাগিয়ে তুলেছে হিমুর চেতনা। মিসির আলী অনেক তরুণকে করেছে বিজ্ঞানমনস্ক, জাগিয়ে তুলেছেন কৌতূহল ও নানা প্রশ্ন।

শুভ্রকে হুমায়ূন আহমেদ ভদ্রগোছের যুবক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আর রূপাকে নিয়েও কম মাতামাতি হয়নি। মধ্যবিত্তের জীবনকে তিনি তুলে এনেছেন সহজ সরলভাবে।

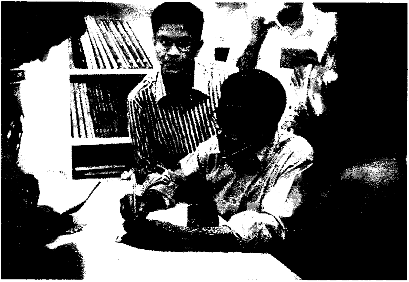

বইমেলায় ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ। বাবার পাশে নূহাশ

এদেশের বহু মানুষকে জোছনা দেখার যে আনন্দ তা তিনি সুন্দরভাবে বলে দিয়ে গেছেন। জোছনা দেখার মাঝেও যে সৌন্দর্য বোধ আছে তা তিনি জাগ্রত করেছেন। বৃষ্টিবিলাসটাও নেহাত কম আগ্রহ জন্মায়নি মানুষের ভেতরে। এটাও তার অবদান।

বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের বই মানেই দেদার বিক্রি। হুমায়ূন আহমেদ মেলায় আসা মানেই পুলিশ দিয়ে ভিড় সামলানো। হুমায়ূন আহমেদ নেই। রয়ে গেছে তার নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, ছবি, গান। আর নুহাশ পল্লী।

শহুরে জীবন বেশি টানত না তাকে। তাই বেশিরভাগ সময় থাকতেন নুহাশ পল্লীতে। শাল-গজারি বনের ভেতর তিনি গড়ে তুলেছিলেন সবুজে ঘেরা স্বপ্নসৌধ। আজ সেখানেই তিনি চির ঘুমে। তার সঙ্গে আছে প্রিয় বৃক্ষরাজি, পাখি আর লীলাবতী পুকুর।

জন্মদিন নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করতেন না। কিন্তু কাউকে ওই বিশেষ দিনে ফিরিয়েও দিতেন না। আনন্দধারার পক্ষ থেকে প্রতিটি জন্মদিনে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানতাম আমি। তিনিও উপহার হিসেবে তুলে দিতেন বই, খেতে দিতেন মিষ্টি।

দেশে থাকা অবস্থায় শেষ জন্মদিনে হুমায়ূন আহমেদ অনেকক্ষণ সময় দিয়েছিলেন সংবাদকর্মীদের। ফেরার সময় ধরিয়ে দিয়েছিলেন খাবার প্যাকেট আর বই। তার আগের বার ধানমন্ডির দখিন হাওয়ার বাসায় জন্মদিনে সংবাদকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দুপুরের খাবারও খেয়েছিলেন।

প্রতিবছরই হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিনে নতুন বই বের হওয়ার রেওয়াজ ছিল। এবারো বসন্ত বিলাপ নামের একটি বই বের করেছে প্রথমা প্রকাশনী।

জয়তু হুমায়ূন আহমেদ। আপনার বাকের ভাই, হিমু, মিসির আলী, রূপা, শুভ্র, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প, মধ্যাহ্ন, মাতাল হাওয়া, বাদশাহ নামদার, গৌরীপুর জংশন, জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল আরো কত লেখাই না আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

না ফেরার দেশ থেকে আপনি দেখবেন নাম না জানা কোনো হিমু মধ্য দুপুরে নগ্ন পায়ে হাঁটছে কিংবা ঝুম বৃষ্টিতে কোনো তরুণী ভিজছে আর আপনার বৃষ্টিবিলাস বইটির কথা স্মরণ করছে কিংবা জোছনাপাগল মানুষ জোছনা রাতে গাইছে...আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।

প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ স্যার, আজ আপনি নেই। ভীষণ মনে পড়ে আপনাকে। ওই যে আপনি বলতেন, সাজু ভালো থেকো। আর বলতেন, সময় পেলেই চলে এসো নুহাশপল্লীতে। এখন এ কথা কে বলবে?

জোছনা আপনার জন্য প্রার্থনা করবে...

প্রথম যেবার নুহাশপল্লীতে গেলাম, প্রায় তিন বছর আগে। তখন আমি দেশের শীর্ষস্থানীয় ম্যাগাজিন আনন্দধারার বিশেষ প্রতিনিধি। হুমায়ূন আহমেদ একটি ঈদের নাটকের শুটিং করছিলেন। মীর সাব্বির, মেহের আফরোজ শাওন, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করছিলেন নাটকটিতে। বিকেলবেলার কথা। শুটিংয়ে বিরতি চলছে। হুমায়ূন আহমেদ আমাকে ও ফটোগ্রাফার আকাশকে সময় দিলেন।

জানতে চাইলেন, 'কখনও এসেছ নুহাশপল্লীতে?' বললাম, 'না স্যার, এবারই প্রথম এলাম।' তিনি বললেন, 'তাহলে চলো নুহাশপল্লীর গাছদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। জানো তো, এখানে অনেক প্রজাতির ঔষধী গাছ আছে।' বললাম, 'স্যার নুহাশপল্লীর গাছ সম্পর্কে আপনার লেখায় পড়েছি।' তিনি একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, 'এই গাছটির নাম রসুন্দি গাছ। গাছের পাতার গন্ধ আর রসুনের গন্ধ একই।' মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনলাম এবং ভাবলাম, সত্যিই কী বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় জাদুকরের সাথে কথা বলছি? নাকি স্বপ্ন দেখছি?

তিনি 'ঘেটুপুত্র কমলা' সিনেমায় শুটিং শুরু করেছেন। নুহাশপল্লীতে শুটিং হচ্ছে। আমি চলে যাই একদিন। নুহাশপল্লীতে ঢুকতেই শুনতে পাই পুকুর পাড়ে শুটিং করছেন তিনি। সেখানে গিয়ে সালাম দিই এবং তারপ পা ছুঁয়ে সালাম করি। দৃশ্যটিতে অভিনয় করেন তমালিকা কর্মকার এবং মামুন। কিন্তু শেষটুকু দেখতে পারিনি আমি। তমালিকা কর্মকার বললেন, 'সাজু ভালো একটা দৃশ্য বড্ড মিস করলি? জানিস, এই দৃশ্যটি করার সময় হুমায়ূন ভাই কেঁদে দিয়েছিলেন।' স্যার কথাটি শুনে হাসলেন। 'ঘেটুপুত্র কমলা'র শুটিং শেষ হয়নি তখনও। দুপুরের খাবার বিরতি । স্যার বললেন, 'চলো খাবে।' একটি গাছের নিচে টেবিল চেয়ার রাখা ছিল। সেখানে তিনি বসলেন। সাথে ছিলেন মেহের আফরোজ শাওন, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রাণ রায়, তমালিকা কর্মকার, মাসুদ আখন্দ এবং আমি। খাবার খেতে খেতে তিন কত গল্পই না করলেন! বিশেষভাবে সাহিত্যিক আহমদ ছফাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন অনেক। এক

পর্যায়ে শাওন বললেন, 'এই সাবধান, এখানে সাংবাদিক আছেন।' অমনি হাসলেন স্যার।

ওই দিনটির কথা কি ভোলা সম্ভব? সারাজীবন ওই স্মৃতি মনে থাকবে আমার। মনে মনে সেদিন ভেবেছিলাম, সাংবাদিক না হলে হয়তো তার এত কাছে যেতে পারতাম না।

নূহাশপল্লীর বাগানে হাঁটছেন হুমায়ূন আহমেদ

স্যারকে নিয়ে আজ কত কি না মনে পড়ছে। আবার এই লেখা লিখতে গিয়ে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কারণ সবার মতো আমিও ব্যথিত। আমিও বোবা কান্না কাঁদছি।

একবার ধানমন্ডির দখিন হাওয়ায় তার জন্মদিনের দিন গিয়েছি। সেটা চার বছর আগে। কত বিষয় নিয়ে গল্প করলেন তিনি। দুটি বই ধরিয়ে দিলেন। মিষ্টি খেতে বললেন, দুপুরে খেয়ে যেতে বললেন। খাবার লোভ ছিল না কোনোদিনই আমার। কিন্তু তার সান্নিধ্যে থাকার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই থেকে গেলাম। সেদিন দুপুরে অন্য প্রকাশের কর্ণধার মাজহার ভাইয়ের বাসায় খাওয়ার আয়োজন। সবাই ফ্লোরে বসে খেলাম। হুমায়ূন আহমেদ ও আসাদুজ্জামান নূর ভাই পাশাপাশি বসে গল্প করলেন। আরেকবার রোজার দিনে নুহাশপল্লীতে গিয়েছি। দুপুরবেলা খেতে বললেন, বললাম, 'স্যার রোজা রেখেছি।' তিনি বললেন 'ইফতার করে যেও, নুহাশপল্লীর ইফতার খুব ভালো হয়।' আমি রয়ে গেলাম। ইফতার করলাম নুহাশপল্লী সবুজ ঘাসে বসে। তিনি, আসাদুজ্জামান

নূর, মাসুদ আখন্দ, পুত্র নিষাদ এবং আমি একপাশে বসে ইফতার করলাম। বিদায় নিয়ে চলে আসব। বললেন, 'ভালো থেকো।' যতবার বিদায় নিয়েছি, তিনি বলছেন, 'ভালো থেকো।' ২০০৯ সালে 'শঙ্খনীল কারাগার' বইটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে লিখে দিয়েছিলেন, 'সাজু ভালো থেকো।'

পুত্র নুহাশের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ

স্যার, ঘুমের দেশে আপনি। এই ঘুম আর ভাঙবে না। সব মানুষই একদিন এই ঘুমের ঘরে চলে যাবে। এবারো আপনাকে দেখতে নুহাশপল্লীতে যাব। কিন্তু আপনি আর বলবেন না 'সাজু ভালো থেকো।'

প্রিয় স্যার, আপনি ভালো থাকবেন। বৃষ্টি আপনার জন্য প্রার্থনা করবে। জোছনা আপনার জন্য প্রার্থনা করবে। সবুজ ঘাসেরা আপনার জন্য প্রার্থনা করবে। আপনার প্রিয় গাছেরা প্রার্থনা করবে।

২৩ জলাই, ২০১১, ইত্তেফাক

হুমায়ূন আহমেদ-এর নুহাশপল্লীতে কি নেই!

গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। সেখানেই সবুজ পরিবেশে গড়ে উঠেছে নুহাশপল্লী। যা নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই।

নুহাশপল্লী নামটি বললে আর বলার অপেক্ষা রাখে না এটি বাংলাদেশের কিংবদন্তি কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের নিজের বাড়ি। এই বাড়ি রাজধানী শহরের কোনো এলাকায় নয়। কথাশিল্পী তার বাড়িটি মনের মতো করে তৈরি করেছেন শহর থেকে বেশ দূরে।

মিডিয়া তো বটেই দেশের মানুষেরও ব্যাপক আগ্রহ বাড়িটি নিয়ে। কারণ একটাই– বাড়িটি হুমায়ূন আহমেদের। প্রতিদিনই শতশত দর্শনার্থী ভিড় করেন সেখানে। প্রবেশের জন্য কোনো টিকিট কাটতে হয় না। দারোয়ানকে বলে কয়ে ভেতরে যাওয়া যায়। ভেতরে প্রবেশের পর বিস্মিত না হলে উপায় নেই। ভাগ্য ভালো থাকলে পেয়ে যেতে পারেন প্রিয় লেখককে। ভাববেন না তিনি কথা বলবেন না। বরং খুবই সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারেন হুমায়ূন আহমেদ। জমিয়ে আড্ডাও দেন। আর যদি শুটিং থাকে তাহলে মন ভরে শুটিং দেখতে পারবেন।

প্রথমবার যারা নুহাশপল্লীতে যান হুমায়ূন আহমেদ তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন অচেনা সব গাছ-গাছালির সঙ্গে। এক জায়গায় এত বাহারি গাছ দেখে চমকে ওঠেন কেউ কেউ। হূমায়ূন আহমেদ বলেন, একবার বনবিভাগ থেকে কর্মকর্তারা এসেছিলেন নুহাশপল্লীতে। তারা এত এত গাছ দেখে চমকে যান। তারা আমাকে বললেন, এখানে এমন কিছু গাছ আছে যা আমাদের সংগ্রহে নেই। পরে বনবিভাগের কর্মকর্তারা আমার কাছ থেকে কিছু গাছ নিয়ে যান এবং বিনিময়ে একটি কমলার বাগান করে দিয়ে যান।

এখন সত্যি সত্যি চমৎকার একটি কমলার বাগান রয়েছে নুহাশপল্লীতে। রয়েছে একটি খেজুরের বাগানও।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি নুহাশপল্লীতে রয়েছে ভূতের জন্য কয়েকটি গাছ।

নুহাশপল্লীর চারদিকে ঘন বন। শাল-গজারির মাঝখানে বিশাল জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে অসাধারণ এই পল্লী। ঢাকা, ময়মনসিংহ রাস্তা আর গাজীপুর থেকে ময়মনসিংহের দিকে যেতে হবে। হোতাপাড়ায় নামতে হয়। ঢাকা জিপিও থেকে হোতাপাড়ার দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার। হোতাপাড়া নেমে সিএনজি ড্রাইভারদের বললেই দেড় থেকে দুইশ টাকা বিনিময়ে পৌঁছে দেবে নুহাশপল্লীতে।

নুহাশপল্লীর এই ভাস্কর্যটি মুগ্ধ করবে যে কাউকে

কী কী দেখতে পারেন নুহাশপল্লীতে? ভেতরে ঢোকার পর দেখা যাবে একটি নারীর ভাস্কর্য। যে কি না তার ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বড় সবাইকে মুগ্ধ করবে ভাস্কর্য দুটি।

কয়েকগজ সামনে হাঁটলে চোখে পড়বে ছোট্ট পুকুর। চারদিকে ইট দিয়ে বাঁধানো। স্বচ্ছ পানি চিক চিক করে সব সময়।

তারপরেই চমৎকার একটি বাড়ি। দূর থেকে মনে হয় বাড়িটি মাটির তৈরি। আসলে ইটের তৈরি বাড়িটিতেই থাকেন হুমায়ূন আহমেদ। বাড়ির দরজা বরাবর রয়েছে বাগান, বিরাট ফুলের গাছ। বাড়িটির ভেতরে রয়েছে বিশাল একটি লাইব্রেরি। ড্রয়িংরুম কাম লাইব্রেরির রুমটিতে আড্ডা দেন তিনি। অন্য রুমগুলো সুন্দরভাবে সাজানো।

গাছের উপরে ঘর! এটিও নুহাশপল্লীতে

একবার পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কবি ও কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন নুহাশপল্লীতে। পুকুরে নেমে গোসলও করেছিলেন। আরো কত বিখ্যাতরা এসেছেন তার হিসাব আছে কি না আমাদের জানা নেই।

হুমায়ূন আহমেদের বাড়িটি পার হলে আবারও ছোট একটি পুকুর চোখে পড়বে। পুকুরে পদ্মফুল দেখতে পাবেন। এরপরই শুরু হবে হরেক রকমের গাছ-গাছালির বাগান।

যারা নয় নম্বর বিপদ সঙ্কেত চলচ্চিত্রটি দেখছেন তারা খুঁজে পাবেন নুহাশপল্লীর ওই দৃশ্য। এ চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে নুহাশপল্লীতে।

এ প্রসঙ্গে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, একটা সময়ে নুহাশপল্লীতে আসতে হতো ইঞ্জিনচালিত নৌকা করে। তখন তো পাকা রাস্তা ছিল না। অনেক কষ্ট করে আসতে হতো। এখন তো আধুনিক যোগাযোগ।

নুহাশপল্লীর ভেতরে বড় একটি দীঘি রয়েছে। যার নাম দীঘি লীলাবতী। দীঘির পাড়ে দুটি পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে– 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে– রয়েছে নয়ন নয়নে'। দীঘির ওপর রয়েছে কাঠের সেতু।

ঔষধি গাছেরও অভাব নেই। সেখানে পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে– রাশেদ হুমায়ূন ঔষধি উদ্যান, তারপর লেখা রয়েছে– আমার ছোট বাবাকে মনে করছি।

মৎস্য কন্যার কথা বলাই হয়নি। রূপকথার মৎস্যকন্যার মতো মৎস্যকন্যা বানানো হয়েছে পাথর দিয়ে। যা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যাবে না।

কয়েকট হাতি বানানো হয়েছে ইট দিয়ে। মাটি উঁচু করে বাঘের মাথা বানানো হয়েছে। সেখান থেকে দেখা যায় বাঘ হা করে আছে– বাচ্চারা ভীষণ মজা পায় এগুলো দেখে।

গাছের ডাল ঘেঁষে একটি ছোট ঘর রয়েছে। যেখানে লেখা আছে– বাচ্চাদের ঘর। এ রকম ছোট ছোট আরো কয়েকটি ঘর আছে নুহাশপল্লীতে। মজার বিষয় নুহাশপল্লীতে বাইরের কাউকে শুটিং করতে দেয়া হয় না। হুমায়ূন আহমেদ তার নিজের পরিচালিত নাটক ও চলচ্চিত্রের শুটিং করেন। তার নির্মাণাধীন ঘেঁটুপুত্র কমলা চলচ্চিত্রের কিছু অংশের শুটিং করেছেন নুহাশপল্লীতে। এ জন্য একটি বাড়ি তৈরিও করেছেন।

বছর দুই আগে হুমায়ূন আহমদ তার এক জন্মদিনে বলেছেন, মৃত্যুর পর আমার কবর হবে নুহাশপল্লীতে। উল্লেখ্য, কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ তার বড় ছেলে নুহাশের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে নুহাশপল্লী।

বিচার কাজ করতে গিয়ে শুরুতে একটা টেনশন কাজ করতো
-হুমায়ূন আহমেদ

আনন্দধারা : এ কথাটি এ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বাংলাদেশের সাহিত্যে শুধু নয়, এ মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠতম কথাশিল্পী আপনি। এ অর্জনের পেছনে শুধু মেধা নয়, রয়েছে অনেক পরিশ্রমও। পাশাপাশি একজন পরিচালক হিসেবেও ব্যস্ততা রয়েছে আপনার প্রচুর। এতো ব্যস্ততার মাঝে ক্ষুদে গানরাজের বিচারক হিসেবে কাজ করছেন। কীভাবে সেটা শুরু হলো তা যদি বলেন।

হুমায়ূন আহমেদ : আমি মনে করি, সব মানুষেরই নানা ধরনের অভিজ্ঞতার দরকার। বিশেষ করে যারা লেখালেখি করেন তাদের যত বেশি অভিজ্ঞতা থাকবে ততই ভালো। একজনের তো সব অভিজ্ঞতার সুযোগ তৈরি হয় না। একজন লেখক কী করেন? তিনি মানুষের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা ধার করেন। কীভাবে ধার করেন? অন্যের বই পড়ে অভিজ্ঞতা নেন। অন্যের সঙ্গে কথা বলে অভিজ্ঞতা নেন। আর কেউ কেউ আছেন যারা নিজেরাই চেষ্টা করেন জীবনে যত বেশি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। বিচারকের অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য একটা বড় ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা ছিল। এটা হচ্ছে বিচারক হিসেবে কাজ করার প্রথম কারণ। দ্বিতীয় আরেকটা কারণ আছে।

আনন্দধারা : সেটা কী জানাবেন?

হুমায়ূন আহমেদ : দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে– আমি সকালবেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি সব চুল পেকে গেছে। অর্থাৎ বয়স হয়ে গেছে। চুলের বয়স কমানো যায়, ওষুধ আছে। কিন্তু অনেকে ভাবেন মনের বয়স কমানোর যায় না। মনের বয়স কমানোর ওষুধও আছে। কঠিন ওষুধ। যত কম বয়সী মানুষের সঙ্গে থাকা যাবে তত মনের বয়স কমতে থাকবে। আমার কাছে মনে হলো আমি যদি বাচ্চাদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাই, মনের বয়সটা দ্রুত কমবে। কাজেই আমি এই রিয়েলিটি শো করতে রাজি হলাম। আরও একটি কারণ আছে।

আনন্দধারা : বলুন।

হুমায়ূন আহমেদ : সে কারণটি হচ্ছে তারা আমাকে রিয়েলিটি শো করার জন্য ৩০ লাখ টাকা দেবে। ৩০ লাখ টাকা আমার জন্য দরকার। কারণ আমি ছবি বানাচ্ছি। টাকা-পয়সা হলে আমি ছবি বানাই, টাকা নষ্ট করি। কাজেই এই টাকাটা পেলে আমার জন্য ছবি বানাতে সুবিধা হবে। বেশিরভাগ সময় আমি নিজের টাকা দিয়েই ছবি বানিয়েছি। অন্যের টাকা দিয়ে ছবি বানানোর একটা সমস্যাও আছে। সমস্যাটি হলো– ওদের টাকা কী বেশি খরচ করে ফেলছি... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সেই টেনশন থেকে মুক্ত থাকব। এই কয়েকটি কারণে আমি রিয়েলিটি শোতে যেতে রাজি হয়েছি। শুরুতে মনে হয়েছিল কিছুদিন যাওয়ার পর ব্যাপারটি আমার কাছে ভালো লাগবে না। ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু না। আমি দেখেছি যতই দিন যাচ্ছে ততই ভালো লাগছে।

ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায় বসে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ

আনন্দধারা : ওরা অসম্ভব ভালো গান করছে।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ। বাচ্চাগুলো এত চমৎকার গান করে যা কাছাকাছি না গেলে বুঝতে পারতাম না। একটি বাচ্চা ক্লাসে ওয়ানে পড়ে, একটি বাচ্চা ক্লাস টুতে পড়ে। ক্লাস থ্রির একটি বাচ্চা কখন গানটি ধরতে হবে তা জানে। তাল বুঝে, গলার স্কেল কী তা জানে, এটা আমার জন্য একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমি উপভোগ করছি কাজটি।

আনন্দধারা : এই কাজটি করতে গিয়ে কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা?

হুমায়ূন আহমেদ : প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে, অনেক বড় একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটছে।

আনন্দধারা : সেটা কেমন?

হুমায়ূন আহমেদ : ক্ষুদে গানরাজে একটি ছোট বাচ্চা আছে। যে কি না গান করে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা করে টাকা-পয়সা যা পেত তা নিয়ে দৌড় দিত দোকানে। দোকান থেকে চাল কিনে বাড়ি যেত। বাড়িতে নেয়ার পর রান্না হতো এবং সে রান্না তার পরিবারের লোকজন খেত। গানের ভিক্ষার টাকা। এটা দেখে স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী প্রধান ব্যক্তি বাচ্চাটাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন এবং লালন পালন করতে থাকেন। গানের গলায় মুগ্ধ হয়েই কাজটি করেন। একটি ভিক্ষুক ছেলে এই প্রতিযোগিতায় গান করছে এটা দেখাও আমার জন্য অনেক ছিল বড় একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনা। বাচ্চাটি এখন টপ টেনে চলে গেছে।

আনন্দধারা : টপ টেনে?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন কথা। তাদের গানের শিক্ষক থাকবে, গানের জন্য আলাদা সময় থাকবে, বিভিন্ন গানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করবে। অথচ এই বাচ্চা তো পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে গান শিখেছে।

আনন্দধারা : আর কোনো ঘটনা?

হুমায়ূন আহমেদ : আরেকটি ঘটনা বলি। একটি বাচ্চা বলছে তার ক্ষুদে গানরাজ হওয়ার খুব শখ। ক্ষুদে গানরাজ হতে পারলে সে টাকা পাবে এবং টাকা দিয়ে তার মাকে দামি একটি শাড়ি কিনে দেবে। তার মায়ের কোনো শাড়ি নেই। বাচ্চাটির মায়ের ভালো কোনো শাড়ি নেই। 'মা বিড়ি বাঁধে। দৈনিক বিড়ি বেঁধে মা পায় ১২ টাকা।' এই হচ্ছে তার সোর্স অব ইনকাম। তার বাবা বাছে, মিষ্টির দোকানোর কারিগর। কিন্তু বাবা এই বাচ্চাটিকে এবং তার মাকে দেখে না। তাদের কোনো ঘর নেই। বাচ্চাটিকে আমি বললাম তোমরা নূহাশপল্লীতে চলে আসো। থাকার ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। খাবার ব্যবস্থাও হবে। পড়ার ব্যবস্থাও হবে। এছাড়া বিড়ি বেঁধে যা আয় হতো তাও দেব। আরও জানতে চাইলাম– তুমি এখন

কী করবে? বাচ্চাটি বলল, আগে মানুষের বাড়িতে কাজ করতাম। এখনও মানুষের বাড়িতে কাজ করব। যাই হোক আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম এরা আসবে না। কেননা হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটি তার মাকে নিয়ে চলে এসেছে। তাকে নুহাশপল্লীতে পাঠানো হয়েছে। ঘরও দেওয়া হয়েছে। এটাও আমার জন্য বড় একটি অভিজ্ঞতা।

আনন্দধারার প্রচ্ছদের জন্য দখিন হাওয়ার বাসায় প্রিয় কথাশিল্পীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সাংবাদিক শাহ আলম সাজু

আনন্দধারা : বিচার কাজটি করেছেন কীভাবে?

হুমায়ূন আহমেদ : বিচার কাজ করতে গিয়ে একটা টেনশন কাজ করত আমার ভেতর। ফুলের মতো ছোট ছোট বাচ্চা। কীভাবে নাম্বার দেবো, কাকে কম নাম্বার দেবো? এখন টপটেনে চলে এসেছে। এখন আর নাম্বার দেয়ার টেনশন নেই। দর্শক ঠিক করছে সব। যারা বেরিয়ে এসেছে অর্থাৎ এই ১০ জন সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে এদের যে কেউ ক্ষুদে গানরাজ হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং সে ক্ষমতাও এদের আছে। এখন কে হবে সেটা নির্ধারণ করবে টেলিফোন কোম্পানি। যদি টেলিফোন কোম্পানি না থাকত তাহলে এসএমএস থাকত না। এতে করে পুরো কৃতিত্ব থাকত বিচারকদের। এখন সম্পূর্ণ বিষয়টা চলে গেছে আমজনতার হাতে। এদের কারো কারো হয়তো প্রচুর পয়সা আছে। প্রচুর এসএমএস করতে পারবে। দরিদ্র বাচ্চা তো এসএমএস করতে পারবে

না। আবার দারিদ্র্যকেও পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করবে। আমি গরিব, আমাকে ভোট দিন এসব বলে একটা ইমোশন তৈরি করবে। এখন যে অবস্থায় আছে, ঠিকই আছে। আমি আনন্দিত। এখন আর নাম্বার দিতে হবে না।

আনন্দধারা : বিচারক নয়, একজন শ্রোতা হিসেবে আপনি কী মনে করেন। ক্ষুদে গানরাজের শিল্পীরা কেমন গান করছে?

হুমায়ূন আহমেদ : ক্ষুদে গানরাজের শিল্পীরা খুব ভালো গান করছে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৬ কোটি মানুষের দেশে আমরা ১৬ জন ফুটবল খেলোয়াড় বের করতে পারি না! ১৬ কোটি মানুষের দেশে ১৬ জন লেখক আমরা বের করতে পারি না। অথচ আমরা তো প্রত্যেক বছর ১০ থেকে ১২ জন অসম্ভব প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়ে বের করে আনছি এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

আনন্দধারা : কৃতিত্ব এখানে অবশ্যই অনেকটা আয়োজকদের?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার ধারণা চ্যানেল আই খুবই ভালো একটি কাজ করেছে। তবে ক্ষুদে গানরাজের পিতামাতার প্রতি আমার একটি ক্ষুদ্র বাণী আছে। ক্ষুদ্র একটি উপদেশ আছে। কদিন পর ক্ষুদে গানরাজের ছেলেমেয়েরা ইউরোপের নানা দেশে যাবে, আমেরিকায় যাবে। প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করবে। এতে যদি তাদের পড়ালেখায় ক্ষতি হয় তাহলে আমি কষ্ট পাব। যদি পড়ালেখার ক্ষতি না করে গান-বাজনা করে তবেই আমি খুশি হব। তৃপ্তিবোধ করব। কারণ আমার প্রধান পরিচয় হচ্ছে আমি একজন শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে পড়ালেখা বিষয়টি আমি সবার আগে বেশি করে দেখব।

আনন্দধারা : টপটেনের মধ্যে আপনার পছন্দের কেউ কি আছে?

হুমায়ূন আহমেদ : নিঃশব্দ বলে একটি ছেলে আছে। এতটুকু বয়সে যে আবেগ দিয়ে গান করছে! সুরেলা কণ্ঠ তার। তার গানের প্রতিভা দেখে আমি মুগ্ধ। এই ছেলেটি যদি সেরা হয় অর্থাৎ ক্ষুদে গানরাজ হয় তাহলে আমি খুব খুশি হব। আরেকটি মেয়ে আছে। নাম তার অপূর্ব বাসনা। তালমিস্ত্রির মতো মিষ্টি গলা মেয়েটির। এই মেয়েটি সেরা হলেও খুশি হব। আরেকজন আছে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। যখন গানে টান দেয় চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হবে পরিণত বয়সের কেউ গাইছে। মেয়েটির নাম ঋদ্ধ। এই কজন আমার খুবই পছন্দের। তাই বলে অন্যরা অপছন্দের নয়। সবাইকে আমি পছন্দ করি। গানের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে।

আনন্দধারা : কেমন স্যার?

হুমায়ূন আহমেদ : মনে করো, ছয়টি ছেলেমেয়ে গান করছে। ছয় জন ছয় রকম গান করছে। একটি গান করার দিক থেকে হয়তো অনেক সুন্দর। একজনের গানের সুরের এমন ক্যারিশমা আছে, যা অন্যের গানে নেই। যেহেতু

তারা সমান গাইছে এখন, কাজে যে সবচেয়ে ভালো করবে সে এগিয়ে যাবে। আমার মতে একটা পর্যায়ে এসে প্রত্যেকের একই গান গাওয়া উচিত। আধুনিক গান হলে প্রত্যেকের একই গান গাওয়া উচিত। আধুনিক গান হলে প্রত্যেকে সেটাই গাইবে। রবীন্দ্রসংগীত হলেও প্রত্যেকে সেটাই গাইবে।

আনন্দধারা : এতে করে কী মনোটনি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না?

হুমায়ূন আহমেদ : থাকতে পারে। কিন্তু আমরা তো মনোটনাস ব্যাপারটা দেখব না। আমরা দেখব শ্রেষ্ঠ কে হলো। আর এটা তো সবার মতামত না। অবশ্যই আমার মতামত।

আনন্দধারা : স্যার, আপনি তো অজয় চক্রবর্তীর নাম জানেন। আমরা জানি, একজন সম্ভব ভালো শ্রোতাও আপনি। অজয় চক্রবর্তী একবার একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা বড় শিল্পী তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তার যুক্তিটা হচ্ছে, সাধারণত ভোটিং পাওয়ার ১৮ বয়স হলেই পাওয়া যায়। এখানে ভোটিং পাওয়ার সবারই আছে। এটা তার একটা পয়েন্ট ছিল। দ্বিতীয় পয়েন্ট ছিল প্রতিটি মানুষের ভোট দেয়ার ক্ষমতা একটিই থাকে। অথচ এখানে যত খুশি ভোট দিতে পারছে। এতে প্রপার জাজমেন্টটা হয় না।

হুমায়ূন আহমেদ : এটা হচ্ছে আমরা বিচারকরা যে কজন চূড়ান্ত করে দিয়েছি, এই কয়টা তো বের করা গেছে। এটাও তো কম ব্যাপার নয়। আর ভোটাভুটি মানে একটা গড়মিলের ব্যাপার চলে আসে। ধরুন, ফার্মগেটে একজন পাগলী আছে। পাগলীর ছেলেমেয়ে নয় জন। একজন শিক্ষিত মানুষের ছেলেমেয়ে বড় জোর দুইজন। এখন নির্বাচন হলে কে জিতবে? পাগলী জিতবে না? পাগলীই জিতবে।

আমাদের ময়মনসিংহ ভাটি অঞ্চলে দশটার নিচে ছেলেপেলে বলা হয় আটকুঁড়া। কমপক্ষে ১০ জন হতে হবে। বাচ্চারা কিন্তু আমাকে ভীষণ পছন্দ করে। কক্সবাজারে যাব এ জন্য বাচ্চারা আমাকে বলেছে স্যার ফ্লাইটে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে চলেন।

আনন্দধারা : আরেকটি অভিজ্ঞতা।

হুমায়ূন আহমেদ : দুই রকমের ঘটনা পৃথিবীতে থাকবে। কিছু থাকে খুবই পজিটিভ ঘটনা। কিছু থাকবে খুবই নেগেটিভ। কয়েনের দুটি পিঠ। তবে আমার স্কুলে পড়ার সময় আমার রেজাল্ট কী হলো না হলো, তা নিয়ে আমার বাবা-মা কখনই চাপ দিতেন না। স্কুলে খুব খারাপ রেজাল্ট করতাম। ক্লাস এইটেও। বাবা কোনোদিনও প্রেসার ক্রিয়েট করতেন না। পরে মনে হলো বাবা যখন স্টুডেন্ট ছিলেন নিশ্চয়ই তার ওপর খুব প্রেসার পড়ত। প্রেসার ছিল বলেই তিনি তার ছেলেমেয়েদের প্রেসারটা দিতে চাননি।

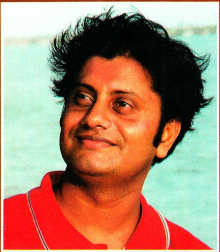

১৯৯৬ সাল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র শাহ আলম সাজু। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যতোটা না টেনেছে তার চাইতে বেশি টেনেছে লেখালেখি। ওই বছরই একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম গল্প। সেটা দৈনিক সংবাদ-এ।

১৯৯৮ সাল। ছোটদের জনপ্রিয় পত্রিকা কিশোর তারকালোক-এ সাংবাদিকতা শুরু। পরে পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক। একই বছর ঢাকা বইমেলায় প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস।

প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দশটি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে সাংবাদিকতা ও লেখালেখি ছাড়া করা হয়নি কিছুই। বেকার থাকার অভিজ্ঞতাও আছে।

পাক্ষিক আনন্দভুবন পত্রিকায় প্রথম স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান। এরপর দৈনিক মানবজমিন-এ স্টাফ রিপোর্টার ও আনন্দধারার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।

বর্তমানে দেশের শীর্ষ স্থানীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার-এর স্টাফ রিপোর্টার। এখন পেশা ও নেশা সাংবাদিকতা। মাঝে মাঝে গল্প-উপন্যাস লেখা আর অবসরে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো শখ।

শাহ আলম সাজুর জন্ম টাংগাইল জেলার সখীপুরে।

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET